শৈলেশ দে

তুলি-কলম

১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

দ্বিতীয় সংস্করণ,
আশ্বিন, ১৩৭৬
সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

প্রকাশক :
কল্যাণব্রত দত্ত
১, কলেজ রো,
কলকাতা-৯

মুদ্রক
জলধর পাল
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেস
১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ
জহর দাস

ভূমিকা লিপিতে সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাবার রীতি আছে। কিন্তু আমি কাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো! এ গ্রন্থ রচনার শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত সবটাই যে কৃতজ্ঞতার ইতিহাসে ভরা।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ে প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক পরম শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়ের কথা। 'আমি সুভাষ বলছি' এবং 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' এর মত এ গ্রন্থ রচনার ব্যাপারেও তাঁর সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা আমি পেয়েছি অকৃপণ ভাবে। বিশেষ করে অগ্নিযুগের নানা অজ্ঞাত তথ্য সম্বলিত নিজের অপ্রকাশিত 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব' গ্রন্থ থেকেও যে ভাবে তিনি আমাকে প্রয়োজনীয় মাল মশলা পরিবেশন করেছেন, তা সত্যই দুর্লভ। 'ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব' প্রকাশের পথে। অগ্নিযুগের ইতিহাসে এ গ্রন্থ একটি মূল্যবান দলিল রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই।

কৃতজ্ঞতা জানাই প্রাক্তন যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভার পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুগায়ক শ্রীযুক্ত বিভূতি দাশগুপ্তকে। শহীদ বৈকুণ্ঠ সুকুলের এই অবিস্মরণীয় কাহিনী তিনি যদি জনসমক্ষে তুলে না ধরতেন, তাহলে এমন একটি অভূতপূর্ব তথ্য হয়তো অজ্ঞাতই থেকে যেতো চিরদিন। এ কাহিনী তিনি লিখেছিলেন শারদীয়া সংখ্যা 'কম্পাস' পত্রিকায়। পরে সেই কাহিনীই আবার নতুন করে 'শিখা' পত্রিকায় লিখেছিলেন শ্রীযুক্ত রক্ষিত রায়। বৈকুণ্ঠ সুকুল সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যই আমি সংগ্রহ করেছি তাঁদের লেখনী থেকে।

প্রখ্যাত বিপ্লবী নিকুঞ্জ সেনের 'বক্সার পরে দেউলী' গ্রন্থ থেকে দেউলী বন্দী নিবাসের বিচিত্র জলসার কাহিনীটি নিয়েছি। আর শহীদ মহাবীর সিং ও শহীদ মোহিত মৈত্রের নিঃশেষ আত্ম-বিসর্জনের কাহিনী সংগ্রহ করেছি প্রাক্তন আন্দামান বন্দীদের মুখপত্র 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান' থেকে।

শহীদ দীনেশ গুপ্ত সম্বন্ধে আলিপুর জেলের এই বিশেষ ঘটনাটির বিবরণ শ্রদ্ধেয় সুনীল সেনগুপ্ত নিজেই একদিন ব্যক্ত করেছিলেন আমার কাছে। এঁদের সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থের কাছেও আমি বিশেষ ভাবে ঋণী। গ্রন্থগুলি হল, নগেন্দ্র কুমার গুহ রায় রচিত—'শহীদ যুগল,' হেমন্ত চাকী রচিত—'অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী' এবং জ্যোতিপ্রসাদ বসু রচিত—'বিপ্লবী কানাইলাল'।

শুরুতে কবিগুরুর রচনা থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা হয়েছে। ১৯৩১ সনে জন্মদিনের অভিনন্দনের উত্তরে কবি অত্যন্ত প্রীত হয়ে এই শুভেচ্ছা বাণীটি লিখে পাঠিয়েছিলেন বক্সা দুর্গে আবদ্ধ বন্দীদের উদ্দেশ্যে।

এ ছাড়াও যে আমাকে বিস্তর পত্র পত্রিকার সাহায্য নিতে হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তবে সেদিক থেকে আমাকে কোনদিনই খুব একটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি। কারণ, হাত বাড়ালেই শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাঠাগার বালীগঞ্জ ইনষ্টিটিউট। সে সব দায় দায়িত্ব ওঁরাই বহন করেছেন বরাবরের মত।

২১বি, ফার্ণ রোড,
কলি-১৯

বালীগঞ্জ ইনষ্টিটিউটের সভ্য ও সভ্যাদের উদ্দেশ্যে—

স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ :

আমি সুভাষ বলছি

বিনয়-বাদল-দীনেশ

রক্ত দিয়ে গড়া

শপথ নিলাম

ক্ষমা নেই

ও

অন্যান্য।

"নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে
রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না
মানিল বন্ধন॥
ফোয়ারার রন্ধ্র হোতে
উন্মুখর উর্দ্ধস্রোতে—
বন্দীবারি উচ্চারিল আলোকের
কী অভিনন্দন।

'অমৃতের পুত্র মোরা' কাহারা
শুনালো বিশ্বময়!
আত্ম বিসর্জন করি' আত্মারে কে
জানিল অক্ষয়।"......

—রবীন্দ্রনাথ

৭ই মার্চ। শুক্রবার।

হঠাৎ তোমার আবির্ভাব। সঙ্গে একরাশ দাবী। গল্প শোনাতে হবে। অগ্নিযুগের গল্প।

মানতেই হবে। কারণ দাবীটা তোমার।

কিন্তু একটা কথা। অগ্নিযুগের কত গল্পই তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

সেই অতুলনীয় বীরত্ব, সেই নিঃশেষ আত্মবিসর্জন, এর কি শেষ আছে কোথাও। তার মধ্যে কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা তোমাকে শোনাব বল তো?

ঠিক হয়েছে। তুমি তো একালের একজন নামী গায়িকা। বিশেষ করে গানের জলসায় তো আজকাল তুমি ছাড়া কোন কথাই নেই। আমি বরং তোমাকে অগ্নিযুগের কয়েকটা জলসার কাহিনী শোনাচ্ছি কল্যাণী।

একজন গায়িকা হিসাবে এ কাহিনীগুলো তোমার জানা উচিত। তাতে আর কিছু না হোক, সেকালের এবং একালের রুচি এবং চিন্তাধারার তফাতটা নিশ্চয়ই তোমার নজরে পড়বে। যাক, শোন।

'সর্ ফরোশী কি তমন্না অব্ হমারে
দিল্ মে হ্যায়,
দেখনা হ্যায় জোর কিত্‌না বাজুএ
কাতিল মে হ্যায়।'

গানটি তুমি শুনেছ কি কল্যাণী?

নিশ্চয়ই শোননি। অনেকদিনের পুরনো গান। না-শোনাটাই স্বাভাবিক।

তবে তখনকার সময়ে কিন্তু এ গানটি হাটে, মাঠে, পথে, প্রান্তরে —সর্বত্র শোনা যেত। শোনা যেত সবার মুখে মুখে।

আজ আর শোনা যায় না।

ইতিমধ্যে অনেকদিন কেটে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। মানুষের চিন্তাধারারও পরিবর্তন ঘটেছে। তাই স্বাভাবিক কারণেই গানটি আজ হারিয়ে গেছে বিস্মৃতির এক অতল গভীরে। হারিয়ে গেছে সেদিনের সব কিছুই।

বোধহয় শেষবারের মত গানটি শোনা গিয়েছিল মহানগরীর কোলাহল থেকে অনেক দূরে, অভূতপূর্ব এক গানের জলসায়।

সে জলসা রঞ্জি স্টেডিয়াম, রবীন্দ্র সদন বা মহাজাতি সদনের মত কোন আলো-ঝলমল প্রাসাদোপম অট্টালিকাতে অনুষ্ঠিত হয়নি।

বাংলা বা বঙ্গের কোন শিল্পী-সমাবেশও সেখানে ছিল না। কোন রাজ্যপাল বা মেয়রও সেখানে উপস্থিত ছিলেন না তাঁদের বহুমূল্য বাণী-বিতরণের জন্য। ছিল না জাতীয় জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ, চিত্রতারকাদের অভাবনীয় সমাবেশ।

তবু সে জলসার কোন তুলনা নেই কল্যাণী। ভারতবর্ষ তো দূরের কথা, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন জলসা আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

এ জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৪ সনের ১৩ই মে, গয়া সেন্ট্রাল জেলে।

এর নায়ক—বৈকুণ্ঠ সুকুল। পাশেই ছিলেন প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার পঞ্চায়েত মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় বিভূতি দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানের শিল্পী হিসেবে বিভূতিবাবুই এতদিন পরে সেই জলসার কাহিনী ব্যক্ত করেছেন দেশবাসীর কাছে।

বিভূতিবাবুর পরে প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক শ্রদ্ধেয় ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়। বিভূতিবাবুর সেই জলসার কাহিনীই আবার তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন ন[illegible]ন করে। কারণ এ জলসা শুধু জলসা নয়, জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো এক মৃত্যুঞ্জয়ী [illegible]

মূল্যবান জীবন-দর্শন। এ কাহিনী আজকের দিনের সংগ্রামী মানুষের কাছে বার বার তুলে ধরা উচিত।

গয়া জেলে অনুষ্ঠিত সেই জলসার কাহিনী আমি সংগ্রহ করেছি তাঁদের লেখনী থেকেই। যাক, এবার শোন।

১৯৩৪ সন। আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধে বিভূতিবাবু তখন গয়া সেন্ট্রাল জেলের পনেরো ডিগ্রী সেলে বন্দী।

পাশের ছুটি সেলে রয়েছেন আরো ছুজন বন্দী। রঘুনাথ পাণ্ডে ও ত্রিভুবন আজাদ। অপরাধ সেই একই। অর্থাৎ, আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়া।

সকাল থেকেই গয়া সেন্ট্রাল জেলে সেদিন সাজ-সাজ রব।

ভোর-রাত্রে এক কিশোর বন্দীকে ফাঁসি দেওয়া হবে। উপর থেকে নির্দেশ এসে গেছে। আর দেরি নয়। কালই।

প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত। ম্যানিলা রজ্জুতে মোম মাখানো হয়ে গেছে। সমান ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে পরীক্ষার পালাও শেষ। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

কে এই বন্দী?

কি তার নাম?

নাম—বৈকুণ্ঠ সুকুল। বিহারের মজঃফরপুর জেলার বৈকুণ্ঠ সুকুল।

বৈকুণ্ঠ সুকুল! বিস্ময়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়লেন বিভূতিবাবু।

বৈকুণ্ঠ সুকুল যে তার চেনা। খুবই চেনা। মাত্র ছু-বছর আগে পাটনা ক্যাম্প জেলে তার পরিচয় হয়েছিল বৈকুণ্ঠ সুকুলের সঙ্গে।

আশ্চর্য ছেলে বৈকুণ্ঠ সুকুল। অবাঙালীদের মধ্যে এমন রবীন্দ্র-ভক্ত ছেলে সত্যই বিরল।

ক্ষণে ক্ষণে সে কি তার সকাতর মিনিত। রবীন্দ্রনাথের ঐ

কবিতাটা একটু তর্জমা করে দিন না দাদা। আর এই কবিতাটার ভাবার্থ একটু বুঝিয়ে দিন ভাল করে।

একদিনের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। তন্ময় হয়ে সেদিন তিনি আবৃত্তি করে চলেছিলেন কবিগুরুর 'মরণ মিলন' কবিতা থেকে কয়েকটি লাইন।

'আমি ফিরিব না করি' মিছে ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।'

ঠিক পেছনেই বসেছিল ফুটফুটে একটি লাজুক কিশোর। আবৃত্তি শেষ হতে না হতেই সেই নিষ্পাপ কিশোরটি তার ছোট্ট একটি দাবী পেশ করেছিল কুণ্ঠিত ভাবে।

—কবিতাটা আমাকে একটু হিন্দী হরফে লিখে দিন না দাদা। আমি মুখস্থ করব।

—কি নাম তোমার?

—বৈকুণ্ঠ সুকুল।

—দেশ কোথায়?

—মজঃফরপুর।

তারপর অনেক দিন। অনেক ভাবে। দাবী সেই একই। এটা একটু বুঝিয়ে দিন। ওটা একটু তর্জমা করে দিন হিন্দীতে।

সেই বৈকুণ্ঠ সুকুল। সেবার এসেছিল আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে, এবার এসেছে ফাঁসির আসামী হয়ে।

কারণ? কারণ, সে নাকি এক ঘৃণ্য দেশদ্রোহীকে চরম শাস্তি দিয়েছে নিজের হাতে। ফলে—প্রাণদণ্ড।

কে সেই ঘৃণ্য দেশদ্রোহী?

কেনই বা বৈকুণ্ঠ সুকুল তাকে এভাবে শাস্তি দিয়েছিল নিজের হাতে?

কি এর কারণ ?

এ প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদের আরো কয়েক বছর পিছিয়ে যেতে হবে কল্যাণী। ফিরে যেতে হবে রক্তস্নাত পঞ্চনদের রাজধানী সেই লাহোরে।

১৯২৮ সন।

ভারতের দিকে দিকে সেদিন নবজীবনের সাড়া। নতুন দিনের সঙ্কেত। স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার। আমরা স্বাধীনতা চাই।

সঙ্গে সঙ্গে বিলেত থেকে এক কমিশন এসে হাজির। তোমরা শান্ত হও। বল, কি চাও তোমরা ?

আমরা দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে দেখব। সব কিছু শুনব। তারপর ফিরে গিয়ে সব কিছু রিপোর্ট করব মহামান্য সরকার বাহাদুরের কাছে। তারপর তিনি বিবেচনা করে দেখবেন যে, তোমাদের জন্য কিছু করা যায় কি না।

কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন মিঃ সাইমন। তাঁর নামানুসারেই এ কমিশনের নাম হল 'সাইমন কমিশন'।

সপারিষদ সাইমন এসে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল গোটা ভারতবর্ষে।

আশ্চর্য, যেখানে সাইমন, সেখানেই হরতাল। লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে সেখানেই রব ওঠে—'গো ব্যাক সাইমন'। ওসব ছল-চাতুরীতে আমরা ভুলছিনে। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য—স্বাধীনতা। স্বাধীনতার কোন বিকল্প নেই। গো ব্যাক।

কলকাতা-বম্বে-মাদ্রাজ—সর্বত্র একই চেহারা। সর্বত্র একই সংবর্ধনা। গো ব্যাক সাইমন। আমাদের দেশ থেকে তুমি ফিরে যাও।

এবার এল লাহোরের পালা। তারিখটা ছিল ১৯২৮ সনের ৩০শে অক্টোবর।

সমগ্র পাঞ্জাব সেদিন উত্তাল। গো ব্যাক সাইমন—সাইমন ফিরে যাও। তোমাদের কোন কথা আমরা শুনতে চাই না। গো ব্যাক।

বিরাট মিছিল। সবার হাতে কালো পতাকা।

সবার পুরোভাগে পাঞ্জাবের অবিসংবাদী নেতা লালা লাজপত রায়। তাঁরও মুখে সেই একই ধ্বনি। গো ব্যাক সাইমন।

তবে রে! ইঙ্গিত পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংস্র হায়েনার মত।

তারপরই শুরু হল একটানা লাঠি-চার্জ। সামনে-পেছনে ডাইনে-বামে শুধু লাঠি—লাঠি আর লাঠি। চালাও হুকুম পাওয়া গেছে। সুতরাং চালিয়ে যাও একতরফা।

লালাজী প্রবীণ জননেতা। কিন্তু কে কার কথা শোনে। বৃষ্টি-ধারার মত লাঠি পড়ছে অবিরাম। তার মধ্যে কে গেল, কে রইল, তার হিসেব নিকেশ করার মত অবকাশ তখন কোথায়!

রক্তে রক্তে সারা দেহ লাল হয়ে গেল লালাজীর, তবু তিনি সেই একই কথারই পুনরাবৃত্তি করতে লাগলেন বার বার। গো ব্যাক সাইমন। সাইমন ফিরে যাও।

তবে আর বেশীক্ষণ নয়। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে তারপরই একসময়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন শক্ত মাটির বুকে।

সে জ্ঞান আর তাঁর কোনদিনই ফিরে এল না কল্যাণী। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অচেতন দেহটাকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। তারপর ক'দিন ধরে যমে-মানুষে লড়াই, তবু কিছুতেই কিছু হল না। ১৭ই তারিখে তিনি শহীদ-তীর্থে চলে গেলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সৃষ্টি করে।

খবর শুনে একটা বিস্মিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। লালাজী নেই, এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত।

কিন্তু আমরা এর বিচার চাই। এতবড় অন্যায় আমরা কিছুতেই মুখ বুজে সহ্য করব না। এর প্রতিকার চাই।

কিন্তু বিচার করতে চাইলেই বিচার করা যায় না। ওরা যে শাসক। পরাধীন ভারতবাসীর সে অধিকার কোথায়? সে শক্তিই বা কার আছে?

'আমাদের আছে।' রক্তের অক্ষরে শপথ নিলেন ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ পাঞ্জাবের বীর বিপ্লবীবৃন্দ।

ওসব বৈরাগ্য সাধন মুক্তিতে আমাদের আস্থা নেই। তত্ত্বকথাও আর শুনতে চাইনে। আমাদের সোজা হিসেব, লাইফ ফর লাইফ। ব্লাড ফর ব্লাড। এছাড়া অন্য কোন হিসেব জানা নেই আমাদের।

কার হুকুমে সেদিন পুলিশ-বাহিনী লালাজীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এমন করে?

কে তার জন্য দায়ী?

দায়ী পুলিশের বড়কর্তা মিঃ স্কট। তাকেই এবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে লালাজীর প্রাণের বিনিময়ে। অত্যাচারীর ক্ষমা নেই। তার প্রমাণ সে যথাসময়েই পাবে।

প্রমাণ পাওয়া গেল ১৭ই ডিসেম্বর, ঠিক একমাস পরে। বিকেল তখন চারটে বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট।

পুলিশ-দপ্তরের বাইরে দাঁড়িয়ে ভগৎ সিং, রাজগুরু, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ বিপ্লবীগণ সেদিন প্রস্তুত।

অফিস থেকে মিঃ স্কটের বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে। এলেই হয় একবার। গুলীভরা রিভলবার তার জন্য তৈরিই আছে।

ঐ যে সেই শয়তানটা বেরিয়ে আসছে। ঐ যে সে মোটর সাইকেল নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে একটু একটু করে। রেডি প্লীজ! চার্জ!

নিমেষে রাজগুরুর হাতের অস্ত্র আগুন ছড়াল—ত্রাম! ত্রাম! ত্রাম! তুমিই সেদিন লালাজীকে হত্যা করেছিলে তোমার দাসানুদাস পুলিশ-বাহিনীর সাহায্যে। এবার তাকিয়ে দেখ যে, আমরা পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা তার যথাযোগ্য জবাব দিতে পারি কিনা।

ত্রাম! ত্রাম! ত্রাম! এবার জবাব দিলেন ভগৎ সিং নিজে। যদিও রাজগুরুর অব্যর্থ গুলী তাকে ধূলিশয্যা নিতে বাধ্য করেছে, তবু বিশ্বাস কি! একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়াই ভালো।

গুলীর শব্দে ছুটে এলেন একজন ইয়োপীয়ান সার্জেন্ট ও নিহত ব্যক্তির বডিগার্ড চন্দন সিং। সাহস ত কম নয় এই বিপ্লবীদের। দাঁড়াও, মজাটা দেখাচ্ছি!

ত্রাম! ত্রাম! ত্রাম! সঙ্গে সঙ্গেই চন্দন সিং মুখ থুবড়ে পড়ল চন্দ্রশেখর আজাদের অব্যর্থ গুলীতে। মজা দেখার জন্য আর তাকে চোখ মেলে তাকাতে হল না।

শুরু হল হৈ-চৈ চিৎকার আর চেঁচামেচি। ঐ যে ছুটে পালাচ্ছে, ধর ওদের।

কিন্তু সব বৃথা! কাকে ধরবে! দেখা গেল কেউ কোথাও নেই।

আরও দেখা গেল যে, নিহত ব্যক্তি স্কট নন, অন্য একজন পুলিশ অফিসার, মিঃ স্যাণ্ডার্স।

শুরু হল পাইকারী হারে গ্রেপ্তার ও তদন্ত। কারা এই হত্যাকারী? যে করে হোক, তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। বিচারের নামে ফাঁসি-কাঠে ঝোলাতে হবে।

গ্রেপ্তার করবে! চ্যালেঞ্জ জানালেন বিপ্লবী তরুণবৃন্দ। ঠিক আছে, তোমাদের ক্ষমতা থাকে তো গ্রেপ্তার কর।

২১শে ডিসেম্বর। ঠিক তার চারদিন পরের কথা।

কাণ্ড দেখে শহরবাসী সেদিন অবাক। এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত।

আততায়ীদের গ্রেপ্তারের জন্য প্রচুর টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে শহরের সর্বত্র এক ইস্তাহার বিলি করা হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে নয়, বিপ্লবীদের তরফ থেকে। তাতে লেখা রয়েছে :

'এতদ্বারা মহামান্য সরকার ও পুলিশ-বাহিনীকে জানানো হচ্ছে যে, তাদের মধ্যে কেউ স্যাণ্ডার্সের আততায়ীদের গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলে, হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টির সামরিক অধিকর্তার তরফ থেকে তাকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দেওয়া হবে।'

ভাবতে পার কল্যাণী! চিন্তা করতে পার একবার!

পাঞ্জাব পুলিশ কিন্তু চিন্তা করতে পারেনি। বৈপ্লবিক সংস্থা হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টি যে এভাবে কোনদিন চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে, তা বুঝি তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

ক'দিন বাদেই ভগৎ সিং চলে এলেন কলকাতায়।

হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিকান পার্টির জন্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োজন। বাংলা বিপ্লবের পীঠস্থান। বাংলাদেশের বিপ্লবীরা কি এ ব্যাপারে তাকে একটু সহায়তা করবে না?

সামান্য কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোটাকয়েক বোমা নিয়ে আবার একদিন ভগৎ সিং ফিরে গেলেন লাহোরে। সারা মুখে তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্পের রেখা।

আঘাত হানতে হবে। শক্ত আঘাত। এমন আঘাত হানতে হবে, যার ফলে গোটা পাঞ্জাব যেন নিমেষে ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠে। মৃত্যুকে যেন হাসিমুখেই তারা জয় করতে শেখে।

সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে শাসকদের মধ্যেও যেন তার প্রচণ্ড শব্দ একটা তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

নিশ্চয়ই তোমার মনে একটা প্রশ্ন জাগছে কল্যাণী। ভাবছ, কেন অহেতুক এই মৃত্যু-অভিসার?

এক শাসক গেলে অন্য শাসক আসবে। তাহলে কি লাভ শুধু শুধু এই প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার সর্বনেশে খেলায় মেতে?

দু-একটা সাহেব মরলেই কি দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে?

না, তা যাবে না। বিপ্লবীরা আর যাই হোক, নির্বোধ নন। দু-একটা সাহেব মারলেই যে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে না, এই সহজ সরল বুদ্ধিটুকু তাদেরও ছিল।

তবু তারও প্রয়োজন আছে। স্বাধীনতা শিশুর হাতের খেলনা নয়। চাইলেই তাকে পাওয়া যায় না। তার জন্য জাতিকে উপযুক্ত হতে হয়। নির্ভয় হতে হয়। তাকে ভালবাসতে হয়।

তাই তো স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপ্লবীরা তাদের সবচাইতে প্রিয় জিনিসটা উৎসর্গ করে হাসতে হাসতে। কারণ তারা জানে যে, জীবন দিয়েই জীবনকে পেতে হয়। ভিক্ষায় বা দর-কষাকষি করে তা পাওয়া যায় না।

এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক শ্রদ্ধেয় বারীন ঘোষ কি বলেছিলেন শোন:

'We did not mean or expect to liberate our country by killing a few Englishmen. We wanted to show people how to dare and die.'

আরো প্রাঞ্জল করে বলেছিলেন মহান বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়া। ধিংড়াই প্রথম শহীদ, যিনি সর্বপ্রথম ফাঁসি-মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন বিদেশের কারাগারে।

বিচারকালে ইংল্যাণ্ডের ওল্ড বেইলি আদালতে দাঁড়িয়ে দৃপ্তকণ্ঠে ধিংড়া বলেছিলেন:

'The only lesson required in India at present is to learn how to die and the only way to teach it is by dieing ourselves.'

অর্থাৎ, ভারতবর্ষকে বর্তমানে কেবল একটি মাত্র শিক্ষাই গ্রহণ করতে হবে, সে হল মৃত্যুবরণের শিক্ষা। এবং সে শিক্ষা দেবার

মৃত্যুহীন প্রাণ

ক্ষুদিরাম
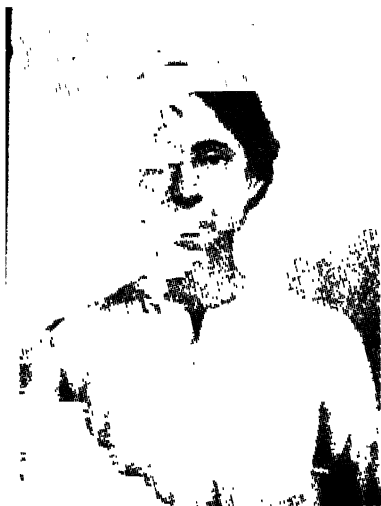
প্রফুল্ল চাকী

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

কানাইলাল দত্ত
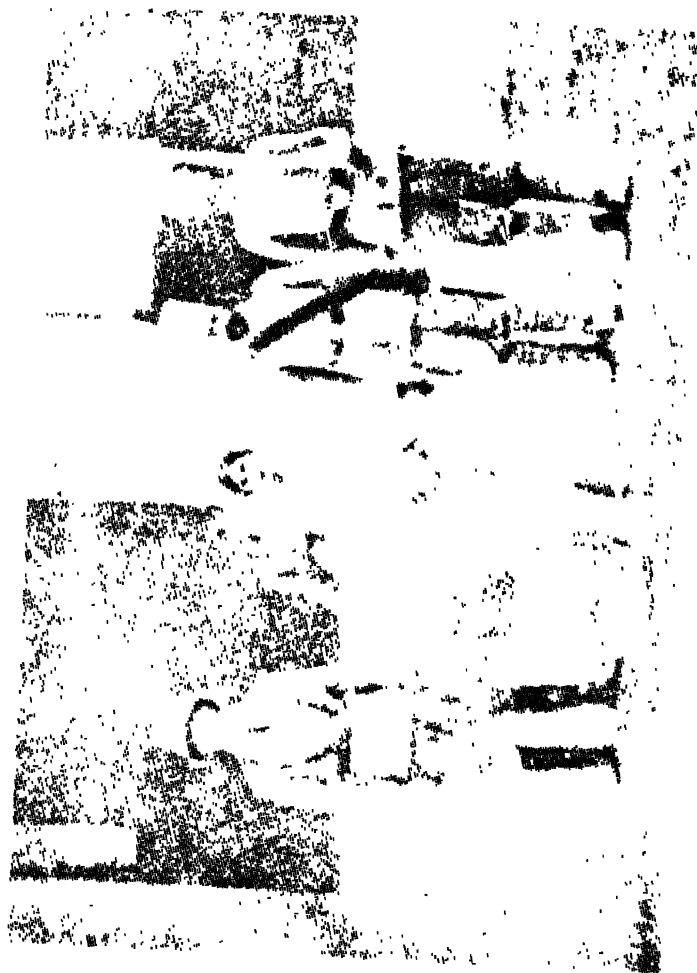
শৃঙ্খলাবদ্ধ ক্ষুদিরাম (পেছনে ফিটনের আহত সহিস)

সেই বোমা বিধ্বস্ত ফিটন গাড়ীটি

আলিপুর কোর্টে শৃঙ্খলাবদ্ধ কানাইলাল ও সত্যেন বসু
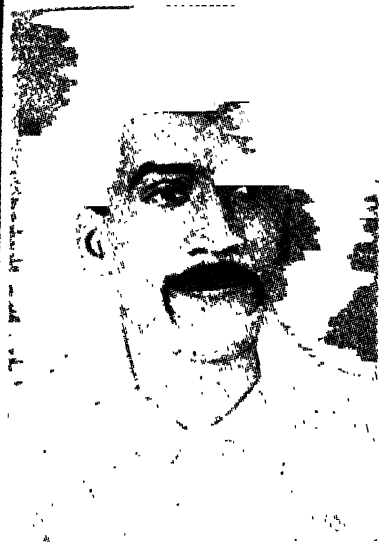
অরবিন্দ

হেমচন্দ্র দাস

দেশবন্ধু

বটুকেশ্বর দত্ত

প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী

অনন্তহরি মিত্র

দীনেশ গুপ্ত
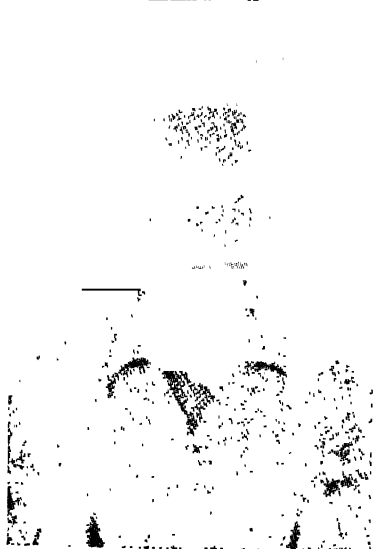
সত্যেন বর্ধন

ভগৎ সিং

শুকদেব

রাজগুরু

যতীন দাস

রাজেন লাহিড়ী

আসফাকউল্লা

রামপ্রসাদ বিসমিল

ঠাকুর রোশন সিং

পদ্ধতিও মাত্র একটি—নিজে মৃত্যুবরণ করে মৃত্যুভয়হীন হবার শিক্ষাদান।

ভগৎ সিংয়েরও সেই একই কথা। নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। প্রাণ দিতে হবে। মৃত্যুভয়ে ভীত সাধারণ ভারতবাসী যেন দেখতে পায় যে, কি করে, কত সহজে প্রাণ দিতে হয়।

পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ পেল ১৯২৯ সনের ৬ই জুন।

স্থান—দিল্লী অ্যাসেমব্লি। কতকগুলি জরুরী বিল নিয়ে আলোচনা হবে। এবার শুরু হবে সেই আলোচনা।

বিশিষ্ট দর্শকদের মধ্যে রয়েছেন সেই মিঃ সাইমন। আর রয়েছেন স্পীকার বিঠলভাই প্যাটেল

হঠাৎ দর্শকের আসনে উপবিষ্ট দুটি বলিষ্ঠ তরুণ রাশি রাশি লাল ইস্তাহার ছড়িয়ে দিলেন গোটা অ্যাসেমব্লি হলে। তারপরই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—বুম্‌বুম্‌!

কিছুই দেখা গেল না। কিছুই বোঝা গেল না শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। সব কিছুই ঢাকা পড়ে গেল নিশ্ছিদ্র কালো ধোঁয়ার অন্তরালে।

শুরু হল হৈ-চৈ, চিৎকার চেঁচামেচি। কি হল? কে করেছে এমন কাজ?

'আমরা করেছি।' হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে ধীর অবিচলিত ভাবে আত্মসমর্পণ করলেন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। কাউকে হত্যা করা আমাদের লক্ষ্য নয়। সে ইচ্ছে থাকলে সাইমনকে আর এতক্ষণ বেঁচে থাকতে হত না। আমাদের উদ্দেশ্য তোমাদের এই পাবলিক সেফটি বিলের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড প্রতিবাদ করা। কারণ—

'It takes a loud voice to make the deaf hear.'—Let the government know that while protesting against the Public safety and the Trade Dispute Bills and

callous murder of Lala Lajpat Rai, on behalf of the helpless Indian mas, we want to emphasise the lesson often repeated by history that it is easy to kill individuals but you can not kill ideas. Great empires crumbled while ideas survive····

We are sorry to admit that we attach great sanctity to human life. But the sacrifice of individuals at the alter of great revolution that will bring freedom to all rendering exploitation of man by man impossible, is inevitable. Long Live Revolution.'

'বধিরকে শোনাতে হলে প্রচণ্ড কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন। মহামান্য সরকার শুনে রাখ যে, ভারতবর্ষের অসহায় জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমরা 'পাবলিক সেফটি বিল', 'ট্রেড ডিস্পুট বিল' এবং তোমাদের দ্বারা নিহত লালা লাজপত রায়ের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানাচ্ছি। জেনে রাখ যে, ব্যক্তিবিশেষকে হত্যা করা সহজ, কিন্তু তার আদর্শকে হত্যা করা সম্ভব নয়। বিশাল সাম্রাজ্য একদিন ধূলোয় গড়িয়ে পড়ে, তা বলে আদর্শের মৃত্যু ঘটে না।

মানুষের জীবনকে আমরা পবিত্র বলে মনে করি। কিন্তু যে মহান বিপ্লব দেশকে মুক্ত করবে, যার আবির্ভাবে মানুষ আর মানুষকে কোন মতেই শোষণ করতে সক্ষম হবে না, তার বেদীমূলে বহুলোককে উৎসর্গ করতেই হবে। তা অনিবার্য। বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।'

একটিমাত্র বোমার শব্দেই তোলপাড় হয়ে গেল গোটা ভারতবর্ষ। গোটা ইংল্যাণ্ড।

এমন কি ব্রিটিশ সরকারের প্রাক্তন ল' মেম্বার এস. আর. দাশ পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে,—that the bomb was necessary to awaken England. অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডের ঘুম ভাঙানোর জন্য এই বোমার প্রয়োজন ছিল।

সাবধান-বাণীতে এতটুকুও কান দিলেন না মহামান্য ব্রিটিশ সরকার।

দেবার কথাও নয়। কারণ পৃথিবীর কোন দেশের কোন সাম্রাজ্যবাদী সরকারই দেওয়ালের লিখন পড়তে অভ্যস্থ নয়।

শুধু ইংল্যাণ্ড কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই কি ইতিহাসের সেই অনিবার্য পরিণামকে বুঝতে চেয়েছে কোনদিন! তাহলে এতবড় শক্তিমান রাষ্ট্র হয়েও আজ তাকে পদে পদে এমন করে অপদস্থ হতে হচ্ছে কেন একফোঁটা ভিয়েতনামের কাছে?

শুরু হল ব্যাপক গ্রেপ্তার। শুকদেব, রাজগুরু, যতীন দাস ইত্যাদি সবাইকেই গ্রেপ্তার করা হল একে একে। যতীন দাসকে গ্রেপ্তার করা হল ১৪ই জুন, কলকাতায়। তারপরই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে।

এই যতীন দাসই যে পরবর্তীকালে দীর্ঘ তেষট্টি দিন অনশনের পরে দেহরক্ষা করে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিলেন, সে কথা তো তুমিও জান।

১৯২৯ সনের ১০ই জুলাই স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে শুরু হল তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

আসামী ভগৎ সিং, শুকদেব, বটুকেশ্বর দত্ত, রাজগুরু, যতীন দাস প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ। অপরাধ—বৃটিশ সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ ঘটানোর চেষ্টা এবং স্যাণ্ডার্স হত্যা।

যতীন দাসকে অবশ্য ধরে রাখা গেল না। তার আগেই তিনি তিল তিল করে নিজেকে নিঃশেষ করে দিলেন দীর্ঘ তেষট্টি দিন অনশনের পরে।

শুরু হয়েছিল ১৪ই জুন। সেদিন সর্বপ্রথম ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্ত অনশন শুরু করেছিলেন রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য বিশেষ কতগুলি সুবিধা দাবী করে।

১৩ই জুলাই থেকে বাকী এগারো জন। যতীন দাস তাদের অন্যতম।

শুরুতে অবশ্য যতীন দাসের এ ব্যাপারে খুব একটা সমর্থন ছিলনা। তাঁর এক কথা। আমি মাঝ পথে থামতে জানিনে। শুরু করলে শেষ পর্য্যন্ত দেখে নিতেই আমি অভ্যস্থ। 'I shall stick to the last.'

কথায় বলে—মরদকী বাত আর হাতীকা দাঁত। কাজেও তাই দেখালেন যতীন দাস। এই প্রসঙ্গে তখনকার সময়ে লাহোর থেকে প্রকাশিত দৈনন্দিন বুলেটিন থেকে কিছু কিছু অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি কল্যাণী। এগুলো থেকেই তুমি বুঝতে পারবে যে, দেশ ও দশের প্রয়োজনে কি অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গেই না সেদিন মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন দাস নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন তিলে তিলে।

২৫শে জুলাই :

'বলপূর্বক আহার করাইবার চেষ্টার ফলে যতীন দাসের অবস্থা খারাপ হইয়াছে। এক্ষণে তিনি মৃত্যুশয্যায়। জেল কর্তৃপক্ষ অনশনব্রতীদের সঙ্কল্প নষ্ট করিবার আদেশ দেওয়ায় বলপূর্বক আহার করাইবার জন্য সাত আট জন লোক নিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ আসামীদের বুকে চড়িয়া বসে, কেহ হাত চাপিয়া ধরে, কেহ আসামীদের নাকে মুখে নল দিয়া খাদ্যদ্রব্য প্রবেশ করায়।

যতীন দাস অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাঁহার নাড়ী লুপ্ত হয়। ডাক্তার আসিয়া ঔষধের সাহায্যে তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন।'

আসামী অজয় ঘোষ বলেন :

'যদি যতীনের মৃত্যু হয় তবে সেইজন্য গভর্ণমেণ্ট দায়ী হইবেন। গত পরশু জোর করিয়া খাওয়াইবার সময় যতীন দাস যখন ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বলা হয় যে, তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হইবে। বোধ হয় সে শিক্ষা তাঁহাকে দেওয়া হইতেছে।'

২৬শে জুলাই :

'যতীন দাস এখনও সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে অবস্থান করিতেছেন। তিনি ইনজেকসন্ লইতে অসম্মত হইয়াছেন।

....তাঁহাকে বলপূর্বক খাওয়াইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কারণ ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক মহাশয় জানাইয়াছেন, যদি ইহার কোন কুফল হয়, তবে তিনি তাহার জন্য দায়ী হইবেন না।'

৩১শে জুলাই :

'যতীন দাসের অবস্থা ক্রমশঃই গুরুতর হইতেছে জানিয়া চিকিৎসকেরা তাঁহার সেবা-শুশ্রূষার নিমিত্ত একজন নার্স নিযুক্ত করিতে চাহেন, কিন্তু যতীন দাস তাহাতে নিজ অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। সুতরাং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিরণচন্দ্র দাসকে সমস্ত রাত্রি তাঁহার সহিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

রাত্রিতে শ্রীযুক্ত দাসের গলা শুকাইয়া আসিতেছে দেখিয়া কিরণচন্দ্র তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জলপান করিতে দেন, কিন্তু তিনি জলপান করিতে অস্বীকার করেন।

যতীন দাসকে যখন গ্রেপ্তার করা হয় তখন তাঁহার ওজন ছিল এক মণ ৩৪ সের। আজ তাঁহার ওজন এক মণ ১৭ সের হইয়াছে।'

১লা আগষ্ট :

'আজ সকাল বেলা জেলে তদন্ত করিয়া জানা গিয়াছে যে, যতীন দাসের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার নাড়ীর স্পন্দন কমিয়া মিনিটে ৪৫ বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। শরীরের তাপও স্বাভাবিকের নীচে নামিয়া গিয়াছে।......ছোট ভাই কিরণ দাস জেল হাসপাতালে যতীন দাসের সহিত অবস্থান করিতেছেন।'

৫ই আগষ্ট :

'যতীন দাসের অবস্থা একেবারেই আশাপ্রদ নহে। তাঁহার শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক অবস্থারও নীচে। নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে

৫০ বার এবং তিনি দ্রুতগতিতে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন। বিছানাতেও তিনি নড়াচড়া করিতে অক্ষম।'

৬ই আগষ্ট :

'যতীন দাসের অবস্থা উদ্বেগজনক হইয়া পড়িয়াছে। এখন তিনি একরূপ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছেন।...গত রাত্রিতে খুব ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাইয়াছেন এবং তাঁহার বুকে অতিশয় বেদনা হইয়াছে।'

৮ই আগষ্ট :

'কারাগারের বন্ধুর অনুরোধে ঔষধ-পথ্য গ্রহণ করিতে সম্মত করাইবার উদ্দেশ্যে গতকল্য অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় সর্দার ভগৎ সিংকে যতীন দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বোরষ্টাল জেলে আনায়ন করা হয়। ভগৎ সিং গতকল্য সারা রাত্রি যতীন দাসের সঙ্গে ছিলেন।'

১৭ই আগষ্ট :

অদ্য প্রাতে বোরষ্ট্যাল জেলে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, যতীন দাসের শরীর দ্রুত ক্ষয় হইয়া যাইতেছে।...তাঁহার ভ্রাতাকে দিবারাত্র তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।'

২৫শে আগষ্ট :

'যতীন দাসের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। তাঁহার শরীরের ওজন ২৬ সের কমিয়া গিয়াছে। তাঁহার চোখের দোষ ঘটিয়াছে এবং তিনি দুই ফুট দূরের জিনিসও দেখিতে পান না।'

২৭শে আগষ্ট :

'গত রাত্রি হইতে যতীন দাসের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার চক্ষুর তারার গুরুতর দোষ ঘটাতে তিনি চক্ষু মেলিতে পারিতেছেন না। তিনি এখন প্রায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায় শায়িত আছেন।

সন্ধ্যাকালে যাহা জানা গেল, তাহা আরও উদ্বেগজনক। তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন। তাঁহার মস্তিষ্ক রক্তশূন্য হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার পদদ্বয় প্রায় অবশ হইয়া পড়িয়াছে এবং শরীরে যে একটু সামর্থ অবশিষ্ট ছিল, তাহাও দ্রুতগতিতে লোপ পাইতেছে। তাঁহার হস্ত-তল হিম হইয়া পড়িয়াছে এবং নাড়ীর গতি অনিয়মিত হইয়াছে। তিনি চোখ মেলিতে পারেন না, তাহাতে বেদনা বোধ হয় এবং মাঝে মাঝে তাঁহার বমি হইতেছে।'

১লা সেপ্টেম্বর :

...'যতীন দাসকে একটি ইনজেকসন লইতে অনুরোধ করিবার জন্য ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তকে গতকল্য আবার সেন্ট্রাল জেল হইতে আনায়ন করা হয়। সে সময়ে ডাঃ গোপীনাথও উপস্থিত ছিলেন। তিনিও তাঁহাদের সহিত যতীন দাসকে অনুরোধ করেন, কিন্তু যতীন দাস কিছুতেই সম্মত হন নাই।'

৫ই সেপ্টেম্বর :

'শ্রীযুক্ত দাসের বাম অঙ্গ অবশ, বাকশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি উভয়ই লোপ পাইয়াছে। ....অদ্য সকাল বেলা অনেক কষ্টে তিনি এই ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন যে, মৃত্যুর পর তাঁহার শবদেহ কলিকাতায় লইয়া গিয়া যেন তাহার মাতা ও ভগ্নির চিতার পাশে দাহ করা হয়।'

৬ই সেপ্টেম্বর :

'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যতীন দাসের ভ্রাতা কিরণ দাসের নিকট হইতে নিম্নলিখিত মর্মে এক টেলিগ্রাম পাইয়াছেন—'দাদা যেকোন মুহূর্তে মারা যাইতে পারেন। সংব দপত্রে রিপোর্ট দেখিয়া যাইবেন।'

৮ই সেপ্টেম্বর :

'গতকল্য রাত্রি প্রায় সাত ঘটিকার সময় যতীন দাসের হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল। কিছুক্ষণ গরমজলপূর্ণ বোতলের সেক দেওয়ার ফলে তিনি পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করেন। গত রাত্রিতে

তাঁহার প্রবল জ্বর হইয়াছিল। আজিও তাহার বিরাম হয় নাই। তাঁহার বর্ত্তমান দেহভার এক মণ চারি সের।'

১০ই সেপ্টেম্বর :

'যতীন দাস আজ ৬০ দিন হইল অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তাঁহাকে মাত্র একবার বলপূর্ব্বক আহার করান হইয়াছিল। আর কোনদিনই তিনি কোনরূপ খাদ্য, এমনকি জলটুকু পর্যন্ত গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। এখন যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহাকে জীবিত না বলিয়া মৃত বলিলেই চলে।'

১২ই সেপ্টেম্বর :

'অদ্য যতীন দাসের দেহের উত্তাপ ১০০ ডিগ্রী। তাঁহার হস্ত পদতল হিম। সকাল বেলা তিনি একবার রক্ত বমন করিয়াছেন।'

১৩ই সেপ্টেম্বর :

'বেলা ১টার সময় জেলের ডাক্তারের নিকট অনুসন্ধানে জানা যায়, যতীন দাস আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবেন কিনা সন্দেহ। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দাস বলেন—দাদা আর দুই ঘণ্টাও বোধহয় বাঁচিবেন না।'

আশঙ্কা অমূলক হল না কল্যাণী। বেলা ঠিক একটা বেজে পাঁচ মিনিটের সময় মৃত্যুঞ্জয়ী বীর যতীন দাস শহীদতীর্থে চলে গেলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করে।

নিজ আদর্শের জন্য এ ভাবে তিল তিল করে নিজেকে উৎসর্গ করতে আমাদের দেশে আর কোথাও তুমি দেখেছ কি কল্যাণী?

দেখিয়েছিলেন সেদিন বাংলার দধীচি যতীন দাস। দেখিয়েছিলেন হরেন মুন্সী। আর দেখিয়েছিলেন ঠাকুর মহাবীর সিং, মোহিত মৈত্র, পণ্ডিত রামরক্ষা, মোহন কিশোর প্রমুখ আন্দামানে নির্বাসিত বীর বিপ্লবীবৃন্দ। সত্যিকারের আমৃত্যু অনশন যে কি জিনিস তা তাঁরাই সেদিন দেখিয়ে গিয়েছেন সারা পৃথিবীকে।

আর আজ। আজো আমাদের দেশে এখানে ওখানে আমৃত্যু অনশনের ঘোষণার কথা শোনা যায়। কিন্তু তারপর! যাক, পরের কাহিনী শোন।

যতীন দাস চলে গেলেন। কিন্তু যে দাবী আদায়ের জন্য এই নিঃশেষ আত্মবিসর্জন, তার কি হল! সরকার কি তাঁর সেই দাবী মেনে নিয়েছিলেন কোনদিন?

নিয়েছিলেন বৈকি? কিন্তু যতীন দাস তখন কোথায়? সহবন্দী অজয় ঘোষের মুখ থেকেই সে কাহিনী তুমি শোন:

'যতীন দাসের তখন আর বাঁচবার আশা নেই। সে কথা বলতে পারে না, কানেও শুনতে পায় না—এমনি অবস্থা। তখন বার বার মনে হত,—হায়, জয়লাভ আমরা করেছি, কিন্তু এই জয়লাভের জন্য যে সব চাইতে বেশী ত্যাগ স্বীকার করল, সেতো তার ভাগ পাবে না।

শেষ দিনের কথা মনে পড়ে। মৃত্যুশয্যায় সে শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে বসে আছি আমরা। গলায় কি যেন একটা ঠেলে উঠছিল। অব্যক্ত এক কান্না যেন গুমরে মরছিল।

সে চলে গেল। মুখ তুলে তাকালাম। জেলের নির্দয় কর্তৃপক্ষের চোখ দিয়েও জল ঝরছিল। তার মৃতদেহ জেলের ফটকের বাইরে নিয়ে গেল। সেখানে জমে উঠছিল বিরাট জনতা। লাহোরের পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হ্যামিল্টন হার্ডি সেই জনতার সুমুখে টুপি খুলে ভক্তিভরে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন তাকে—যার কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি পরাজয় স্বীকার করেছে।'

[ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা : অজয়কুমার ঘোষ : পৃঃ ২১]

মৃত্যুর পরে তাঁর মরদেহ নিয়ে আসা হল কলকাতায়। সে দৃশ্য আজ বোধ হয় তুমি কল্পনাও করতে পারবে না কল্যাণী।

হাওড়া ষ্টেশন থেকে শুরু করে কেওড়াতলা শ্মশানঘাট পর্য্যন্ত সে এক অভাবনীয় দৃশ্য। এত বড় মৌনমিছিল কলকাতাবাসী আর কোনদিনই বুঝি দেখেনি এর আগে।

যতীন দাসের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে লেখা হল :

'যতীন্দ্রনাথ দাসের আত্মোৎসর্গে ভারতবর্ষ স্তম্ভিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। এ মরণ তো সহজ নহে। সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণদান করা সহজ, বিষ পান করিয়া দেহত্যাগ করা সহজ, ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন করা সহজ, কিন্তু দিনের পর দিন অনাহারে থাকিয়া তিলে তিলে দেহকে স্বেচ্ছায় জীবনশূন্য করা, জগতে অসাধারণ ব্যাপার।

আয়র্ল্যাণ্ডে ম্যাক্‌সুইনি তাহাই করিয়াছিলেন, জগৎ তাহাতে বিস্মিত হইয়াছিল, আজও শিক্ষিত জগৎ শ্রদ্ধানত হইয়া তাঁহার নাম স্মরণ করে।

ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য শিখগণ প্রাণদান করিয়াছেন। শিখ বালকদের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করিয়া তাহাদিগকে তন্মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছে ; তাহারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় দিনে দিনে শুকাইয়া মরিয়াছে, তবুও ধর্ম ত্যাগ করে নাই।

অত্যাচারীর হস্ত হইতে দেশোদ্ধার করিতে গিয়া কত নর-নারী আজীবন বায়ু চলাচলহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন কারাগারে বাস করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। উহা স্মরণ করিলে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হয়, প্রাণ শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়।

কিন্তু সে প্রাণদান স্বেচ্ছায় নহে, যতীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিলে বাঁচিতে পারিতেন, কিন্তু বাঁচিতে চাহিলেন না। মানুষের আত্মার বল কি প্রচণ্ড, যতীন্দ্রনাথ তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন।' [সঞ্জীবনী : ৩রা আশ্বিন : ১৩৩৬]

মামলায় এতদিন আসামী তালিকাভুক্ত ছিল এঁরা ক'জন।

(১) ভগৎ সিং। (২) শুকদেব। (৩) রাজগুরু। (৪) যতীন দাস। (৫) কিশোরী লাল রতন। (৬) শিব বর্মা। (৭) গয়া

প্রসাদ। (৮) জয় দেব। (৯) কমল নাথ ত্রিবেদী। (১০) বটুকেশ্বর দত্ত। (১১) যতীন্দ্র নাথ সান্যাল। (১২) অগ্রেরাম। (১৩) দেশরাজ। (১৪) প্রেমদত্ত। (১৫) সুরেন্দ্র নাথ পাণ্ডে। (১৬) মহাবীর সিং। (১৭) অজয় কুমার ঘোষ। (১৮) ভগবতী চরণ। (১৯) যশ পাল। (২০) বিজয় কুমার সিংহ। (২১) চন্দ্রশেখর আজাদ। (২২) রঘুনাথ। (২৩) কৈলাস। (২৪) সংগুরু দয়াল।

চন্দ্রশেখর আজাদ প্রমুখ তখনো পলাতক।

তাছাড়া রয়েছেন আরো দুজন। তাঁদের নাম জানা সম্ভব হয়নি পুলিসের পক্ষে।

মামলা তখন জোর কদমে চলছে। ঐতিহাসিক তৃতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

ইতিহাসের পর ইতিহাস। ঘটনার পর ঘটনা। একটি একটি করে ঘটনা ঘটছে আর রচিত হচ্ছে ইতিহাস।

পরবর্তী ইতিহাস ভগৎ সিংয়ের একটি বিবৃতি। সারা দেশ, সারা পৃথিবী বোধ হয় সেদিন চমকে উঠেছিল আদালত-গৃহে ভগৎ সিংয়ের একটি প্রকাশ্য বিবৃতি শুনে। বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন:

'Revolution does not necessarily involve sanguinary strife, nor is there only place in it for individual vendetta. It is not the cult of bomb and pistol. By 'Revolution' we mean that the present order of things which is based on manifest injustice must change.

There should be radical change to re-organise the society on a socialistic basis, so that exploitation of man by man or of nation by nation is brought to an end ushering is an era of Universal peace........

This is our ideal. It (our warning) goes unheeded and the present system of Government continues, a grim struggle

must ensue to pave the way for the consummation of the ideal of Revolution.' (History of Freedom Movement) R. C. Mazumder : P. 527)

বিপ্লব মানে রক্তারক্তি নয়। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা প্রতিহিংসার সেখানে কোন স্থান নেই। 'বোমা পিস্তল-বাদ'ও তাকে বলা চলে না। বিপ্লব মানে, অন্যায় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। সমাজবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজের বিবর্তন ঘটাতে হবে, যার ফ'ল মানুষ মানুষকে শোষণ করতে পারবে না। এক জাতি অন্য জাতিকে ঠকিয়ে স্বার্থোদ্ধার করবে না। ওই পথেই বিশ্বশান্তির পথ প্রশস্ত।

আমাদের এই সাবধান-বাণী উপেক্ষা করলে বর্তমান সরকারকে প্রচণ্ড সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হবে। সেই সংগ্রামই দেশকে টেনে নিয়ে যাবে মহাবিপ্লবের পথে।'

এনি মোর! বন্দীদের লক্ষ্য করে জানতে চাইলেন মহামান্য আদালত, আর কিছু বলার আছে তোমাদের?

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! গেয়ে উঠলেন ভগৎ সিং, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন শুকদেব, রাজগুরু প্রমুখ অন্যান্য সবাই, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

বিচার সাঙ্গ হল ৭ই অক্টোবর। ভগৎ সিং, শুকদেব এবং রাজগুরুকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। বাদবাকী সবাইকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ! রায় শুনেই আবার সবাই ধ্বনি দিলেন সমস্বরে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

তখনকার সময়ের সাময়িক পত্রিকা থেকেই তার বিস্তৃত বিবরণ তুমি শোন:

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অবসান

'১৯২৯ সালের ১০ জুলাই তারিখে লাহোরে এই ষড়যন্ত্র মামলার প্রথম শুনানী আরম্ভ হয়। ১৯৩০ সালের ৭ই অক্টোবর ইহার রায় বাহির হয়।

দীর্ঘ পনেরো মাস ধরিয়া এই মামলা চলে। পরলোকগত যতীন্দ্রনাথ দাস এই মামলারই একজন আসামী ছিলেন। কিন্তু তিনি বিচারকের দণ্ড এড়াইয়া বহু পূর্বেই এই ধরণীর হাজত বাস হইতে চিরমুক্ত হন।

বিচারে ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। কিশোরীলাল, মহাবীর সিং, বিজয় কুমার সিংহ, শিববর্মা, গয়া প্রসাদ, জয়দেব ও কমলনাথ তেওয়ারীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইয়াছে। কুন্দনলাল ৭ বৎসরের ও প্রেমদত্ত ৫ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অজয়কুমার ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ সান্যাল ও দেশরাজ মুক্তি পাইয়াছেন।

রাজ সাক্ষী হওয়ার দরুণ জয়গোপাল, হংসরাজ ভোরা, ললিত মুখার্জী, ফণীন্দ্র ঘোষ ও মনোমোহন মুখার্জী অব্যাহতি পাইয়াছে।

....লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার আইনের ইতিহাসের দিক দিয়া বিশেষ স্মরণীয় হইয়া থাকিবে, কারণ—এই মামলায় দুইবার বিচারক বদলাইতে হইয়াছে, দুইজন বিচারক স্বেচ্ছায় এই মামলা পরিচালনে অস্বীকার করেন এবং বড় লাট লর্ড আরউইনকে তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতার বলে বিচার শীঘ্র শেষ করিবার জন্য 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা অর্ডিন্যান্স' প্রয়োগ করিতে হয়।

আসামীরা এই অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদকল্পে আদালতে আসিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু আইন ও পুলিস কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সুস্থ দেহে আদালতে আসার পরিবর্তে, এমনি ঘটনা-বিপর্যয় হয় যে, কয়েকজনকে দোলায় চড়িয়া আসিয়া মামলা শুনিতে হইয়াছিল।

এই প্রহারের ব্যাপারের পর ট্রাইবুন্যালের সভাপতি জাষ্টিস কোলষ্ট্রিম ও কমিশনার আগা হায়দর এই মামলার সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তাঁহাদের শূন্যস্থলে নূতন বিচারক হইয়া আসিলেন, জাষ্টিস ট্যাপ্ ও স্যার আবদুল কাদের। বিচার শেষ হইল।'

[মাসিক ভারতবর্ষ : অগ্রহায়ণ সংখ্যা : ১৩৩৭]

রায়ের বিরুদ্ধে প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে আদালতে এক আবেদন পেশ করলেন ভগৎ সিং-এর পিতা সর্দার কিষণ সিং।

বাধা দিলেন ভগৎ সিং। অত্যন্ত তীব্র ভাষায় পিতাকে তিনি লিখলেন :

'আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য আপনি স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারপতিদের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া আমি মর্মাহত হইয়াছি। এই কঠিন আঘাত স্থিরভাবে সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার এই আবেদন ভিক্ষা আমার মানসিক শান্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিয়াছে।

আপনি আমার জীবনকে যতখানি মূল্যবান মনে করেন, আমি তাহা মনে করি না। আমার আদর্শকে বলি দিয়া আমার প্রাণকে রক্ষা করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমার বহু সহকর্মীর অবস্থা আজ ঠিক আমারই মত গুরুতর। আমরা সকলে একই আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং এতকাল একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আসিয়াছি। শেষ পর্য্যন্তও আমরা ঠিক সেই ভাবেই থাকিব। উহাতে আমাদের ব্যক্তিগত ক্ষতি যত গুরুতরই হোকনা কেন, কোন ক্ষতি নাই।

পূর্বে আমার যে অভিমত ছিল, আজও তাহা স্থির আছে। আত্মপক্ষ সমর্থন করিলে বোরষ্ট্যাল কারাগারে আমার যে বন্ধুগণ বন্দী হইয়া আছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে।' [ট্রিবিউন পত্রিকা থেকে সংগৃহীত]

ভারতবাসী বিক্ষুব্ধ। ভগৎ সিং জাতীয় বীর। তাঁকে এভাবে ফাঁসি দিলে কিছুতেই আমরা তা মুখ বুজে সহ্য করব না।

পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে।

ঠিক তখনই গান্ধীজী এক চুক্তি করলেন বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে।

ঠিক হল, গান্ধীজী তাঁর অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবেন। আর বড়লাট তার বিনিময়ে সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেবেন কারাজীবন থেকে। কেউ বাদ যাবে না।

শর্ত অনুযায়ী সবাইকে মুক্তি দেওয়া হল। শুধু মুক্তি দেওয়া হল না বিপ্লবীদের। কি বড়লাট, কি গান্ধীজী কারোরই এ ব্যাপারে খুব একটা গরজ দেখা গেল না।

অথচ ৫ই মার্চ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করেই গান্ধীজী সিমলা থেকে এক বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিলেন—এ চুক্তি দেশে সর্ববাদি-সম্মত ভাবে গৃহীত হলে এমন কি সহিংস কাজের জন্য যাদের ফাঁসির হুকুম হয়ে আছে, তাঁরাও মুক্তি পাবেন বলে তিনি আশা করেন।

আশার সমাধি হল ২৩শে মার্চ মধ্যরাত্রে।

দেশবাসীর সমস্ত আবেদন অগ্রাহ্য করে সেদিন ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসি দেওয়া হল লাহোর জেলের অভ্যন্তরে।

লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী সেদিন করাচীর পথে। কারণ পরদিনই ওখানে শুরু হবে কংগ্রেসের অধিবেশন।

তারপর! পরের কাহিনী ভগৎ সিং-এর সহকর্মী মুক্তিপ্রাপ্ত অজয় ঘোষের মুখ থেকেই তুমি শোন :

'বাইরে এসে সেদিন বুঝতে পারলাম, ভগৎ সিং-এর মূল্য আমাদের দেশের কাছে কতখানি। তখনকার দিনে যত সভা হত, সেখানে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে শ্লোগান উঠত—ভগৎ সিং জিন্দাবাদ।

ভগৎ সিং-এর নাম তখন লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে শোনা যেত,

প্রতিটি যুবকের বুকে আঁকা ছিল তারই মূর্তি। আমার বুক আনন্দে ও গর্বে ভরে যেত, যখন ভাবতাম—এমন একজন লোকের সহকর্মী ছিলাম আমি,—যাঁকে আমি চিনতাম।

…১৯৩১ সাল, মার্চ মাস, কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনের ঠিক পূর্বে একদিন তাঁদের ফাঁসি হয়ে গেল। ভগৎ সিং-এর বয়স তখন চব্বিশও পূর্ণ হয়নি।

আমি করাচীর পথে এ সংবাদ পেলাম, যারাই শুনল, শিশুর মতই কেঁদে উঠল। আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম।

একটা ধূমকেতুর মত ভগৎ সিং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে ক্ষণিকের জন্য উদয় হয়েছিল। কিন্তু তাঁর এই ক্ষণিক উদয় ব্যর্থ হয়নি। কোটি কোটি লোকের দৃষ্টি ছিল তাঁর উপর নিবদ্ধ। তারা তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল নূতন ভারতের আত্মার প্রতীক।

মরণে নির্ভীক, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল সে। সে চেয়েছিল আমাদের এই দেশে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে তুলতে এক স্বাধীন গণতন্ত্রের প্রাকার।' [ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা : অজয় কুমার ঘোষ : পৃঃ ২২]

বিক্ষোভে ফেটে পড়ল গোটা ভারতবর্ষ। তারই চরম প্রকাশ দেখা গেল করাচী কংগ্রেসে। প্রথমেই হাজার হাজার বিক্ষুব্ধ তরুণ গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাল কালো পতাকা প্রদর্শন করে।

তাদের অভিযোগ, ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসির জন্য একমাত্র দায়ী হলেন গান্ধীজী।

কেন তিনি চুক্তি করার সময় তাঁদের মুক্তির শর্ত অন্তর্ভুক্ত করেননি। এ চুক্তি কোন চুক্তিই নয়। গো ব্যাক গান্ধীজী। ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

পথে ঘাটে, এখানে ওখানে, সর্বত্র আজ এই ধ্বনিটি শোনা যায় প্রতিটি সংগ্রামী মানুষের মুখে।

এমন কি পণ্ডিত জহরলালও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। প্রায়

প্রতিটি সভা সমিতিতেই তিনি ভাষণ শেষে উচ্চারণ করতেন—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

কিন্তু কার মুখ থেকে যে এই ধ্বনিটি সর্বপ্রথম শোনা গিয়েছিল, সেকথা বোধ হয় আজ আর কারো মনেও নেই।

ভগৎ সিং! অমর শহীদ সর্দার ভগৎ সিং। তিনিই এই মহামন্ত্রের উদ্‌গাতা।

এবার তোমাকে শোনাবো ভগৎ সিং এর সহকর্মী ঠাকুর মহাবীর সিং এর কথা।

ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু ফাঁসি মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করলেন ১৯৩১ সনের ২৩শে মার্চ।

সহকর্মী ঠাকুর মহাবীর সিং প্রমুখ বাকী সবাইকে নির্বাসিত করা হল সুদূর আন্দামানে।

শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু মহাবীর সিংকে আর ধরে রাখা সম্ভব হলনা কল্যাণী। তিন বছর বাদে তিনিও একদিন শহীদ তীর্থে চলে গেলেন বন্ধুদের অনুসরণ করে।

সেই পৈশাচিক নির্য্যাতনের কাহিনী শুনলে আজো বোধ হয় তুমি ঘৃণা ও আতঙ্কে শিউরে উঠবে। 'মুক্তি তীর্থ আন্দামান' পুস্তিকা থেকেই সে কাহিনী এখানে হুবহু তুলে দিচ্ছি।

'ঠাকুর মহাবীর সিং ১৯৩০-এর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন। উত্তর প্রদেশের ঠাকুর পরিবারের এই সন্তান যৌবনের দ্বারপ্রান্তে এসে উত্তর ভারতের বিপ্লবী সংগঠন হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টির সক্রিয় সদস্য হন। এই বিপ্লবী সংগঠনের বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার পরিণতিতে শহীদ ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবের সঙ্গে একই মামলায় অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘমেয়াদী দণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৩৩-এর প্রথম দিকে আন্দামান সেলুলার জেলে দ্বিতীয় পর্বের বন্দীদের সঙ্গে কঠোর কারাজীবনের বিরুদ্ধে অনশন সংগ্রামে মহাবীর সিং ঝাঁপিয়ে পড়েন।

লম্বা, বলিষ্ঠ, জোয়ান চেহারা ছিল এই মহাবীর সিং-এর। একজোড়া পাকানো গোঁফ রাজপুত বীরের ছাপ এঁকে দিয়েছিল তাঁর চেহারায়। অথচ, মিটি মিটি চাউনি ও শিশুর সরল হাসি এক আশ্চর্য মানবিকতার প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছিল তাঁর চোখে-মুখে ও হাব-ভাবে।

সেলুলার জেলের সেদিনকার সেই বর্বর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরণ অনশন সংগ্রাম শুরু হয় ১২ই মে তারিখে। মহাবীর সিং সেদিন থেকেই অনশন শুরু করেন।

৫নং মহলের তিন তলার শেষ দিকের এক কুঠরীতে তালাবদ্ধ অবস্থায় অনশনরত বন্দীর দিন কাটতে থাকে। পাশেই সহবন্দী সিরাজুল হক ও মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা। বদ্ধ কুঠরী থেকেই তাদের সঙ্গে চলে হাসিঠাট্টা ও কথাবার্তার বিনিময়। বহু অনশন সংগ্রামে শাণিত মহাবীর সিং অনশনের ক্লেশকে উপেক্ষা করে দিনের পর দিন পাড়ি দিয়ে চলতে থাকেন।

১৭ই মে দুপুরবেলা থেকে শুরু হয় বলপূর্বক আহার করাবার পালা।

জোয়ান জোয়ান একদল সেপাই কুঠরীর তালা খুলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মহাবীর সিং-এর উপর।

মহাবীর আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন। শুরু হয় প্রচণ্ড ধ্বস্তাধ্বস্তি। এক-দেড় ডজন জোয়ান সেপাই-এর দল মহাবীর সিং-এর প্রচণ্ড প্রতিরোধের সামনে হিমসিম খেয়ে যায়।

কিন্তু, অবশেষে মহাবীরকে তারা কুঠরীর মেঝেয় ফেলে দিয়ে তার বুকে পেটে হাঁটুতে বর্বরভাবে চেপে বসে। মাথাটাকে দুই হাঁটুর চাপে পিষ্ট করে ধরে যাতে তার শায়িত দেহ স্থির হয়ে থাকে।

কিন্তু তবুও চলে মহাবীরের প্রতিরোধ। নাক দিয়ে নল

ঢুকিয়ে দিলে সেই নল গলদেশে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে কাসি দিয়ে নলের অগ্রভাগ দাঁতে চেপে কেটে ফেলেন মহাবীর সিং।

অনশন সংগ্রামের জঙ্গীপনাকে তীব্র করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বর্বরতা চরমে ওঠে। হিংস্র শ্বাপদের মত ক্ষিপ্ত হয়ে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ না করেই নলটিকে চালিয়ে দেয় ফুসফুসের রাস্তায়। তারপর, আহার খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখার ভড়ং দূরে সরিয়ে রেখে সারা নলটাকেই গুঁজে দেয় ফুসফুসে।

ফুসফুস ফেটে গিয়ে মহাবীরের দেহ যন্ত্রণায় কাৎরাতে থাকে। পশুর দল সেই অবস্থায়ই মহাবীরকে ফেলে রেখে কুঠুরী তালাবদ্ধ করে চলে যায়।

যন্ত্রণাকাতর মহাবীরের জ্ঞান আর মাত্র সামান্য কিছুক্ষণ ছিল। সে সময়ে অসহ্য যন্ত্রণার কথা পাশের সহবন্দী সিরাজুল ও মনোরঞ্জনের কাছে ব্যক্ত করলেও নিরূপায় নিঃসহায় যার যার কুঠুরীতে তালাবদ্ধ বন্দীরা কোন সাহচর্যই দিতে পারেনি।

জহ্লাদের দল কিছুক্ষণ বাদেই এসে অজ্ঞান অবস্থায় মহাবীরকে অনশনরত বন্দীদের মাঝ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। সেদিনই রাত একটায় সকলের অগোচরে মহাবীর সিং শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

উদ্বিগ্ন সহবন্দীরা মহাবীরের আর কোনো খবরই পায়নি। কিন্তু, খবর গোপন থাকেনি। তাঁর মৃত্যু সংবাদ পরদিন তাঁদের কাছে পৌছে গেছে।

প্রচণ্ড আলোড়ন শুরু হয় সংগ্রামী বন্দীদের মধ্যে। নিরস্ত্র শহীদ মহাবীরের প্রতি সমস্বরে তাঁরা 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' ধ্বনিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

কাপুরুষ কর্তৃপক্ষের দল মৃত মহাবীরের কোন চিহ্নই রাখতে দেয়নি। গোপনে রাতের অন্ধকারে জেল থেকে তাঁর মৃতদেহ বের করে নিয়ে ভারী পাথর বেঁধে সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়ে দেয়। কিন্তু, মহাবীর সিং শহীদ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।'

অন্যতম সহকর্মী দুর্ধর্ষ পলাতক বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদও রেহাই পেলেন না। তিনিও একদিন শহীদ তীর্থে চলে গেলেন এলাহাবাদের এ্যালফ্রেড পার্কে পুলিসের সঙ্গে তীব্র সংঘর্ষের পরে।

৮ই মার্চ, শনিবার।

কাল তোমাকে ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু ও মহাবীর সিং এর কথা শুনিয়েছি কল্যাণী। আজ শোন গয়া সেণ্ট্রাল জেলের সেই জলসার কথা।

ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরু তিন জনকেই দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড।

কিন্তু একটা কথা। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত অ্যাসেমব্লি হলে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন একথা সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে স্যাণ্ডার্স হত্যার সঙ্গেও যে তাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, একথা পুলিসের পক্ষে জানা সম্ভব হল কি করে?

কে সে কথা পৌঁছে দিয়েছিল পুলিসের কানে?

কে সেই দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক?

ফণী ঘোষ। বিপ্লবী দলের সক্রিয় সভ্য ফণী ঘোষ। বিশ্বাস-ঘাতক ফণী ঘোষ।

এই ফণী ঘোষই সেদিন সবকিছু তথ্য পুলিসের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিল রাজসাক্ষী হয়ে। ফলে তিন-তিনটি তরুণকে সেদিন প্রাণ দিতে হল ফাঁসির রজ্জুতে, আর বাদবাকী সবাইকে মেনে নিতে হল যাবজ্জীবন দীপান্তর।

আর ফণী ঘোষ! তার কি হল?

না, সরকার বাহাদুর অকৃতজ্ঞ নন, তাই দেশদ্রোহীতার পুরস্কার হিসেবে সরকারী ব্যয়ে তাকে একটি সুন্দর দোকান করে দেওয়া হল বিহারের বেতিয়া শহরে।

আর দেওয়া হল একটি সশস্ত্র পুলিস গার্ড তার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। দিন-কাল ভাল নয়। কখন কি ঘটে যাবে কে বলতে পারে! সুতরাং সাবধানতা ভাল।

কিন্তু বিপ্লবীদের অভিধানে দেশদ্রোহীর কোন ক্ষমা নেই। তার একমাত্র শাস্তি হল মৃত্যু। আজ হোক, কাল হোক, বা যেদিন হোক, সেই চরম শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

ফণী ঘোষ কি রেহাই পেয়েছিল নিয়তির সেই অমোঘ নির্দেশ থেকে?

জবাব পাওয়া গেল ১৯৩২ সনের ৯ই নভেম্বর, রাত ঠিক সাতটায়।

সেদিন ফণী ঘোষ তার পাশের দোকানে বসে বন্ধু গণেশপ্রসাদ গুপ্তের সঙ্গে নানাবিধ আলাপ-আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে শিয়রে যে সাক্ষাৎ শমন গিয়ে হাজির হয়েছে, সেদিকে কারোরই এতটুকু খেয়াল নেই।

হঠাৎ ভোজালির এক কোপ্। এক কোপেই ফণী ঘোষ ঠাণ্ডা।

বাধা দিতে চেষ্টা করলেন বন্ধু গণেশপ্রসাদ। ফলে সঙ্গে সঙ্গে আর এক মোক্ষম কোপ্। এবার দুজনেই খতম।

এল পুলিস। এল সিপাই-শান্ত্রী। এল বড় বড় সব অফিসারবৃন্দ।

কিন্তু কোথায় কি। আততায়ীদের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না আশেপাশে।

পাওয়া গেল দিন কয়েক বাদে মিউনিসিপ্যালিটি ভবনের গায়ে লাগানো একটা পোস্টারে। তাতে রক্তের অক্ষরে লেখা রয়েছে :

'ভগৎ সিং, রাজগুরু ও শুকদেবকে ফাঁসি দেবার প্রতিশোধ। আমি আমার বিপ্লবী দল সর্বভারতীয় রিপাবলিকান পার্টির নির্দেশে বিশ্বাসঘাতককে চরম শাস্তি দিয়েছি। বিপ্লবই স্বাধীনতা লাভের একমাত্র পথ। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

তখনকার মত ধরা না পড়লেও তদন্তের ফলে কিন্তু আততায়ীদের নামধাম বিবরণ কিছুই জানতে বাকী রইল না পুলিসের।

মোট দু-জন আততায়ী। বৈকুণ্ঠ সুকুল আর চন্দ্রমা সিং। ধর এবার বৈকুণ্ঠ সুকুল আর চন্দ্রমা সিংকে।

কিন্তু কোথায় বৈকুণ্ঠ সুকুল বা চন্দ্রমা সিং? হাজার চেষ্টা করেও তাদের ধরা সম্ভব হল না।

ধরা পড়লেন দীর্ঘ আট মাস পরে, ১৯৩৩ সনের ৬ই জুলাই।

দু'জনেই সেদিন সোনপুরের বিখ্যাত মেলায় গিয়েছিলেন ছদ্মবেশে। এবার ঘরে ফেরার পালা।

সামনেই গণ্ডক ব্রিজ। ব্রিজ পেরিয়ে একবার ওপারে যেতে পারলেই ব্যস।

কিন্তু একি! ব্রিজের মাঝ-বরাবর গিয়েই কি দেখে সহসা দুজন চমকে উঠলেন দারুণ ভাবে। ব্রিজের দুদিকেই অসংখ্য পুলিস। ডাইনে-বামে, এখানে ওখানে, সর্বত্র পুলিস।

বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তারপরই পুলিসের সাঙ্কেতিক বাঁশি একটানা বেজে চলল বহুক্ষণ ধরে।

ফাঁদ পাতা সার্থক হয়েছে। শিকার জালে পড়েছে। আসামীদের সন্ধান মিলেছে। সবাই চলে এস এদিকে। প্রস্তুত হও। লড়াই আসন্ন।

দূরত্ব ছোট হয়ে এল ক্রমশঃ। গুলীভরা রাইফেল বাগিয়ে দুদিক থেকে বিরাট পুলিস-বাহিনী, বুকে হেঁটে এগুতে লাগল একটু একটু করে। যেন রীতিমত একটা যুদ্ধক্ষেত্র আর কি!

একদিকে বিরাট পুলিস-বাহিনী, অন্য দিকে দুটি মাত্র নিরস্ত্র কিশোর। এ যুদ্ধ আর কতক্ষণ। ফলে দুজনকেই শেষ পর্য্যন্ত ধরা দিতে হল তীব্র সংঘর্ষের পরে।

এবার বিচার। প্রকাশ্য আদালতে নয়, মতিহারি জেলের অভ্যন্তরে।

কারণ বিভূতিবাবুর ভাষায় 'ফুটফুটে নিষ্পাপ কিশোর' হলেও পুলিসের খাতায় বৈকুণ্ঠ শুকুল সম্বন্ধে লেখা—'He was a dangerous criminal.' সুতরাং সরকার কোন রকম ঝুঁকি দিতে রাজী নন। কখন যে কি করে বসবে ঠিক কি! আঙুলের ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে যেতেই বা কতক্ষণ।

শুরু হয়েছিল ৪ঠা ডিসেম্বর। আর রায় দেওয়া হল ১৩ই

ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪ সন। চন্দ্রমা সিংকে দেওয়া হল বারো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। আর বৈকুণ্ঠ সুকুলের প্রাণদণ্ড।

এপ্রিল মাসের শেষের দিকে বৈকুণ্ঠকে গয়া সেণ্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হল ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলাবার জন্য। রাখা হল সাত ডিগ্রির কনডেম্‌ড্‌ সেলে।

১৩ই মে, ১৯৩৪ সন।

সকাল থেকেই গয়া সেণ্ট্রাল জেলে সেদিন সাজ-সাজ রব।

আজ সন্ধ্যায় বৈকুণ্ঠ সুকুলকে সাত ডিগ্রি থেকে নিয়ে আসা হবে পনেরো ডিগ্রির এক নম্বর সেলে।

সেখান থেকেই তাকে ভোর রাত্রে নিয়ে যাওয়া হবে ফাঁসি মঞ্চের দিকে। তাই নিয়ম।

অন্যদিনের চাইতে অনেক আগেই সেদিন জেলের অন্যান্য বন্দীদের লকআপে ঢুকিয়ে দেওয়া হল সাবধানতা হিসেবে।

এবার বৈকুণ্ঠ সুকুলকে সাত ডিগ্রি থেকে নিয়ে আসা হবে এক নম্বর সেলে। 'He was a dangerous criminal.' সুতরাং সাবধানতার প্রয়োজন আছে বৈকি।

এর পরের কাহিনী জলসার প্রধান শিল্পী বিভূতিবাবুর মুখ থেকেই তুমি শোন কল্যাণী।

...'তখনও সন্ধ্যা হয়নি। বিকেলটা সন্ধ্যার দিকে চলেছে।

প্রচণ্ড শীত। কম্বল কুর্তা গায়ে চড়িয়ে লোহার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে আছি। শিকল-বেড়ির ঝনঝন আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠ সুকুল পনেরো ডিগ্রির করিডোরে ঢুকলেন। চিৎকার করে বললেন:

'দাদা, আ গ্যায়া!'

আমরা তিনজনেই পাশাপাশি তিনটি সেল থেকে যুগপৎ সংবর্ধনা-ধ্বনি জানালাম: 'বন্দেমাতরম্‌!'

অনেকগুলো ভারী বুটের শব্দ ; জেলার, ডেপুটি জেলার, বড় জমাদার, সেপাই-শান্ত্রী অনেক—সবাই মিলে মহাসমারোহে তাঁকে নিয়ে এসেছে এক সেল থেকে অপর আর এক সেলে।

এক নম্বর সেলে ঢোকবার কালে ফাঁসির আসামীর শিকল-বেড়ি কেটে দেবার নিয়ম। জেল-কোডে মৃত্যুযাত্রীর জন্য এইটুকু মমতা দেখাবার বিধান আছে।

কিন্তু সুকুলজীর বেলায় তার ব্যতিক্রম। এখানে মহাশক্তিমান ব্রিটিশরাজ মায়া-মমতা দেখাতে অনিচ্ছুক। সুকুলজীর পায়ের বেড়ি কাটা হল না। শৃঙ্খলিত সিংহ গহ্বরে ঢুকে গেলেন।···

এই শিশুর চোখে কি ওরা বন্দী প্রমেথীয়ুসের চোখের আগুন দেখেছিল ?

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। বুঝলাম, সন্ধ্যার গুণতি মিলে গেছে।

অন্ধকার ক্রমে নেমে আসছে। তাকিয়ে ছিলাম এন্টি-সেলের মাথায় ঝুলতে থাকা এক ফালি আকাশের তারাগুলোর পানে।

দাঁড়িয়েই আছি গরাদ ধরে। কোন কিছু করার আছে বা ভাববার আছে বলে মনে হচ্ছে না।

পাশের সেলে ত্রিভুবন, তার পাশে রঘুনাথ—কেউ কোন কথা বলছেন না। দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরাও লৌহগরাদ ধরে।

বুটের শব্দে তাকালাম। বদলীর ওয়ার্ডার ঢুকেছে লণ্ঠন হাতে সেলের তালা দেখতে।

নীরবে এল, নীরবেই চলে গেল। মহামৌন বুঝি কথা কেড়ে নিয়েছেন সবার কণ্ঠ থেকে।

কিছুক্ষণ পরে আমার এন্টি-সেলে প্রবেশ করল ডিউটিরত হাবিলদার। আমার সঙ্গে প্রত্যহ তার সুখ-দুঃখের নানা গল্প হয়।

হাবিলদার যুক্তপ্রদেশের কোন এক পাঠান পরিবারের ছেলে। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। যুদ্ধ-ফেরত সৈনিক।

হাতের লণ্ঠনটি নামিয়ে রেখে কতগুলো সাদা-ফুল আমাকে দিয়ে বলল সে : 'সুকুলজী পাঠিয়েছেন।'

ফুলগুলি তুলে নিলাম গভীর বেদনায়। রেখে দিলাম লোহার তস্‌লাতে।

হাবিলদার শুধাল : 'কি ভাবছেন বাবুজী ?'

'কী আর ভাবব !'

'সুকুলজীকে বাঁচানো যায় না ? লাটের উপরে লাট আছে, তারও উপরে আছে বিলেতের বাদশা, বাঁচানো যায় না তাঁকে ?'

আমি বিস্মিত হলাম, বলে কি রুক্ষ, কঠিন নির্দয় এ সৈনিক ?

সে বলেই চলল, 'বাবুজী, অনেক বীর দেখেছি—অনেক বাহাদুর দেখেছি—কিন্তু এমনটি তো দেখিনি ! আমি গেল যুদ্ধে ভার্দুনে লড়েছি, মেসোপোটেমিয়ায় লড়েছি, মেরেছি অনেক, মরতে দেখেছি অনেক। সাহস, তেজ, বিক্রম, ঝরে ঝরে পড়তে দেখেছি কিন্তু এমন বাহাদুর জীবনে আর কোন দিনই দেখিনি। কখনো ভাবতেই পারিনি যে জোয়ানের এত রূপ।'

এবার সে চুপ করলে।....বুঝলাম, প্রকাশের আবেগে রুদ্ধ হয়ে এসেছে তার কণ্ঠ। মনের বেদনা সে কাউকেই বলতে পারে না। বললে—সেটা হবে রাজদ্রোহিতা।

'যেদিন সুকুলজীর ফাঁসির হুকুম পাকা হয়ে গেল, সেদিন থেকে তাঁর শরীর যেন গোলাপের মত রঙীন হয়ে উঠছে।'

হাবিলদারের উর্দু উক্তি হল—'গুলাব জ্যায়সা—গুল জ্যায়সা খিল রহা থা'।

অর্থাৎ—গোলাপ যেমন, ফুল যেমন বিকশিত হয়ে উঠছে। কবিগুরুর ভাষায় এ যেন—'সকল ব্যথা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠছে।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, ঐ পাষাণবক্ষের অন্তরালে প্রবাহিত অন্তঃসলিলা প্রস্রবন।

পাঠান হাবিলদারের ছুটি চক্ষু বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বলে সে ধরা গলায়—'বাঁচানোর কোন পথ কি নেই? আমার জীবন দিয়েও সুকুলজীকে বাঁচাতে পারলে বুঝতাম যে খোদার কাজ করেছি।'

ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে হাবিলদার চলে গেছে। তার বুটের শব্দ মিলাতে না মিলাতেই এক নম্বর সেল থেকে ডাক এল: 'বিভূতিদা।'

সাড়া দিলাম। লোহার গরাদ দুহাতে ধরে সাড়া দিলাম।

বৈকুণ্ঠ আছে এক নম্বরে। আমি দশ নম্বরে। নিঝুম নিস্তব্ধ রজনী। কাজের কথা শুনতে অসুবিধে নেই। সুকুলজী ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললেন—'একবার ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানটা গাইবেন দাদা? সেই যে- হাসি হাসি পরবো ফাঁসি...'

আমি সে যুগে গান গাইতাম। বেশ জোরালো কণ্ঠে স্বদেশী গান গাইতাম। মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ভাঙা সেলে বসে, জেলের ফাঁসি-মঞ্চে বসে বহুবার 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি' গানটি গেয়েছি।

এ গানে কি যে মধু আছে জানিনে। জেলে, জেলের বাইরে যখনই এ গান গেয়েছি, গান শেষ না হতে কেউ চলে যেতে পারত না।

স্বদেশী গানের ভাণ্ডার আমার কাছে ছিল—বাংলা, হিন্দী, উর্দু বহু গানের—কিন্তু জেলখানায় দেখেছি, 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি'-র মত জনপ্রিয় গান আর একটিও ছিল না।

ক্যাম্প জেলেও আমি গাইতাম, আমাদের নামপাড়ার 'ক্ষ্যাপা'ও গাইত। বিহারী রাজবন্দীরা জাঙিয়া কুর্তা পরে বসে যেত, লোহার থালা-বাটি বাজিয়ে মাথা নেড়ে তাল দিত, একবার শেষ হলে আবার গাইতে বলত।

ক্ষুদিরামের ফাঁসির এ গানটিতে এমনই জাদু ছিল। হোক না

তা অখ্যাত কোন কবির রচিত গান। হৃদয় দিয়ে গড়া এ গান রসের ভিয়ানে ডুবিয়ে তিনি পরিবেশন করে গিয়েছেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুরু করেছি গান। গরাদ ধরে আকাশের পানে তাকিয়ে গাইছি আমার মন ও প্রাণ দিয়ে।

পূর্বগামী ক্ষুদিরামের গান—'হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী'—শুনতে চেয়েছেন নবীন ক্ষুদিরাম, যার কণ্ঠে ঘাতক এসে পরাবে ফাঁসির রজ্জু আর কয়েক ঘণ্টা পরেই।

বহুক্ষণ ধরে গাইলাম সে গান। স্তব্ধ হয়ে শুনছেন এক নম্বর সেলের মৃত্যুঞ্জয়ী বালক, আমার পাশের সেলের সংগ্রামী বন্ধুরা, সমগ্র জেলের সকল কয়েদী।

কারো চোখে সে রাতে ঘুম ছিল না। ঘুম ছিল না সিপাই-শান্ত্রী-মেট-পাহারা-অফিসার কারো চোখেই।

একটা বোবা আর্তনাদ অসহায় আবর্তে সবার বুকে ঝড় তুলেছিল। সে ঝড় নির্বাক।

চোখের আগুন অশ্রু হয়ে ফুটে উঠেছিল কয়েদীর নয়নে শুধু নয়, আকাশের দিকে চেয়ে থাকা অন্ধকারের স্তরে স্তরেও সেদিন ফুটে উঠেছিল চোখের জলের ভাষা। সে ভাষার উত্তাপ অতি গভীরে লুক্কায়িত।

গান শেষ হল। এবারে সুকুলজী বললেন: 'এবার বাঁশি শুনব দাদা।'

বাঁশি! বাঁশি কোথায় পাব জেলখানায়! একটা খালি দেশলাইয়ের খোল আর একটুকরো পাতলা কাগজ হচ্ছে আমার 'ইমপ্রোভাইজ্‌ড্' বাঁশি। এটাই বাজাতাম ফ্লুট এর মত করে। সুকুলজী তা জানতেন।

বাজনা অনেকক্ষণ শুনলেন সুকুলজী। বললেন: 'সুরটা ভারি কোমল।'

আমি বললাম: এটা বিসমিলের 'সর্ ফরোশী কি তমন্না'র সুর।'

সুকুল যেন লাফিয়ে উঠলেন। বললেন : 'গানটার সব পদ মনে আছে দাদা ?'

উত্তর দিলাম : 'গাইছি।'

কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার রামপ্রসাদ বিসমিল ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণ করার আগে এ গানটি রচনা করেছিলেন। গানটি খাঁটি উর্দুতে হলেও জেলের কয়েদীরা সে গান তেমনই অন্তর দিয়ে শুনত, যেমন আন্তরিকতায় শুনত বাংলায় রচিত গান—'বিদায় দে মা ঘুরে আসি।'

এ যে প্রাণোৎসর্গের সামগান। এ গান কোন ভাষার অপেক্ষা রাখে না। যে-কোন হৃদয়েই এর কাঁপন লাগে।

আমার কণ্ঠ জুড়ে বিসমিলের গান। গরাদ ধরে স্তব্ধ নিশীথিনীর আকাশ পানে তাকিয়ে থেকে গেয়ে চলেছি :

'সর্ ফরোশী কি তমন্না অব্ হমারে
দিল্ মেঁ হ্যায়।
দেখনা হ্যায় জোর কিত্না বাজুএ
কাতিল মেঁ হ্যায়।'

(মৃত্যুকে স্পর্শ করার ভাবনা এখন আমার মনে। দেখতে চাই ঘাতকের বাহুতে কত বল আছে।)

গোটা গানটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার গেয়ে চলেছি। আমার সুমুখের আকাশে তারাদের মেলা তখন বিলীন হয়ে গেছে। আমি শুধু দেখছি—উত্তর প্রদেশের এক কারাকক্ষে বিসমিলের দুটি উজ্জ্বল চোখ,—আর বিহারের অপর এক কারাগৃহের এক নম্বর সেলে সুকুলের একখানি সতেজ সুন্দর মুখ।

আমার সঙ্গে সমানভাবে গলা খুলে, প্রাণ ঢেলে সুকুলও গেয়ে চলেছেন।...

আমি গাইছি গানের শেষ দুটি পংক্তি :

'অব্ না অগ্ লে ওয়ল্ লে হ্যায় আউর
না আরমানোকী ভীড়
সির্ফ মর্ মিট্‌নেকি হস্‌রৎ আপ্
দিলে এ বিসমিল মেঁ হ্যায়।'

(এবার থেমে গেছে সমস্ত কলগুঞ্জন, মিটে গেছে সমস্ত বাসনা, শুধু মৃত্যুকে বরণ করার কামনা এখন বিসমিলের হৃদয়ে বিরাজিত।)

কিন্তু সুকুলজী শেষের পংক্তির শেষটুকু নিয়ে উদ্বেল আবেগে বারে বারে গাইতে লাগলেন :

'দিলে এ সুকুল মেঁ হ্যায়'—'দিলে এ সুকুল মেঁ হ্যায়'—'দিলে এ সুকুল মেঁ হ্যায়...'

সে আবেগধারার অর্ঘ্য-নিবেদন সমুদ্রকে নদীর সবটুকু ঢেলে দেবার মতই অন্তহীন ও অকুণ্ঠ।

আমার সম্বল সীমিত। তবু যত গান ছিল, যত সুর ছিল, সব গেয়ে চলেছি অবিশ্রান্ত ভাবে। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মৃত্যুপথযাত্রী শুনতে চাইছেন গান। আমি নীরব থাকি কি করে!

আমার সকল হিয়া, সমস্ত রক্তকণিকা গান হয়ে ঝরে ঝরে পড়তে চায়। এই ভীষণ সুন্দর নিশীথিনীর প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে যে গান দিয়ে, সুর দিয়ে ভরে রাখতে হবে।

ঐ গান-বিছানো, সুর-ছড়ানো পথে যাত্রা করবেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। জ্যোতির্ময় ঐ কিশোরের অপরূপ রূপ রাত্রিশেষে উষা-সমাগমে মিলিয়ে যাবে ঊর্ধ্বতম লোকে, সকল গানের ওপারে।

ডিউটি বদল হল পাহারাদারদের। জমাদার আমার সেলের তালা নেড়ে রোজকার মত চলে গেল না। কাছে এসে বলল : 'বাবুজী, লোহার গরাদ ধরে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন, পাশের সেলের পাণ্ডেজী, ত্রিভুবনজী। আপনাদের কথা বুঝি। আপনারা তো একই পথের

শুধু শোনা নয়, সেই হৃদয় দিয়েই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর আমার সঙ্গে সে গান গেয়ে আমায় ধন্য করেছিলেন।

কখন চারটে বেজে গেছে জানিনে। সুকুল বললেন: 'দাদা, সময় নিকট হইল এখন—এবার শেষ সঙ্গীত হোক—বন্দেমাতরম্।'

এক নম্বর, আট নম্বর, নয় নম্বর—সুকুলজী ও আমরা তিনজন সমস্বরে গেয়ে চললাম—'বন্দেমাতরম্'।

সেই বন্দনা শুধু মাতৃ-বন্দনাই ছিল না, সে ছিল মাতৃরূপা মহামৃত্যুপূজার মঙ্গলাচারণ।

জেল-গেটের ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বেজে গেল। শীতের ঊষা তখনো কুয়াশাচ্ছন্ন, অন্ধকার।

একসঙ্গে অনেকগুলো ভারী বুটের শব্দ পনেরো ডিগ্রির মধ্যে প্রবেশ করল। বৈকুণ্ঠ সুকুল ডাক দিয়ে বললেন:

'দাদা, তব তো চলনা হ্যায়।'

তারপর মুহূর্ত থেমে আবার বললেন: 'একটি অনুরোধ রেখে গেলাম। আপনি বাইরে গিয়ে এবার বিহার থেকে বাল্য-বিবাহ প্রথাটা তুলে দেবার চেষ্টা করবেন।'

আর কিছু নয়। মৃত্যুঞ্জয়ীর অন্তিম অনুরোধ—দেশ থেকে বাল্য-বিবাহ দূর হোক।

কেন তার এই অনুরোধ? কারণ, বৈকুণ্ঠ সুকুলকে ছোট বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

তার কিশোরী বধূ হয়তো আপন গৃহে বাতায়ন খুলে অশ্রুপ্লাবিত নয়নে তাকিয়ে আছেন দূর গয়া জেলের আকাশপথে প্রিয়তমের ঊর্ধ্বগামী দিব্যযাত্রার পানে। বিরহিনী বধূর আসন্ন স্বামীবিয়োগের ব্যথা সঙ্গোপনে নিজের অন্তরে লালন করে সুকুলজী মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

এবার সব নিস্তব্ধ, নিশ্চুপ। সুকুলজীর সেলের তালা খুলে গেল—শব্দ পেলাম। কানে এল সুকুলজী বললেন: 'আমি তৈয়ার আছি।'

দলবল সেল থেকে বেরুচ্ছে—শব্দ শুনছি। সাধারণ ফাঁসির আসামীকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার সময় পিঠমোড়া করে বেঁধে হাতকড়ি লাগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ তারা সাধারণতঃ অনিচ্ছুক মৃত্যুযাত্রী।

কিন্তু সুকুলজীর দল তো স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ যাত্রী। অথচ সুকুলজীর বেলায় তার কোন ব্যতিক্রম হল না। কারণ, পুলিসের ভাষায়—'He was a dangerous criminal.'

এক নম্বর সেল থেকে বেরিয়ে সুকুলজী বোধহয় একটু দাঁড়ালেন। আমাদের সেলের দিকে তাকিয়ে বলতে শুনলাম: 'দাদা, চলি এবার। আবার আমি আসব। দেশ তো স্বাধীন হয়নি। আবার আসব। বন্দেমাতরম্।'

আমরা তিনজনে সমস্বরে ধ্বনি তুললাম—'বন্দেমাতরম্।' সারা জেলে ধ্বনি উঠে গেল—'বন্দেমাতরম্।'

তারপর নিশ্চুপ পৃথিবী। মৃত্যুর পদসঞ্চারে স্তব্ধ সবার কণ্ঠ। শুধু সুকুলজীর কণ্ঠে তখনো শুনছি: 'বন্দেমাতরম্। ভারতমাতাকী জয়!'

মুক্তির অগ্রদূত, রক্তরঞ্জিত কঠিন পথের ক্ষত-বিক্ষত একক-যাত্রী—তার কণ্ঠধ্বনি মন্ত্রের মত করে সকলে সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে শুধুই শুনছে, তাকে নিজেদের কণ্ঠস্বরে আবৃত করার মন আর কারো নেই।

শেষ ধ্বনি মর্মে এসে লাগল—'ভারতমাতাকী'—মাঝ-পথে সে ধ্বনি থেমে গেল। সমগ্র কারাগার প্রতিধ্বনিত করে আওয়াজ হল—'হুম্!'

সমাপ্ত হয়ে গেল একটি তরুণ নটরাজের জীবন-নৃত্য।

৯ই মার্চ। রবিবার।

কাল তোমাকে শুনিয়েছি গয়া জেলে অনুষ্ঠিত জলসার কথা।

তা বলে অগ্নিযুগের ইতিহাসে গয়া জেলের সেই জলসাই কিন্তু একমাত্র জলসা নয় কল্যাণী, এমনি অসংখ্য জলসা সেদিন অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিভিন্ন জেলের অভ্যন্তরে, এবং বৈচিত্র্যের দিক থেকে তার কোনটাই বোধকরি কম উল্লেখযোগ্য নয়।

যেমন গোরখপুর জেলের জলসা। সে জলসার নায়ক ছিলেন বীর বিপ্লবী শহীদ রামপ্রসাদ বিসমিল।

ফাঁসির পূর্বে বিসমিলের রচিত গানটি শুনতে গিয়ে বৈকুণ্ঠ সুকুল যে কতখানি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, সে কথা তোমাকে আগেই বলেছি। এই বিসমিলই একদিন ফাঁসির পূর্বে গোরখপুর জেলের কনডেম্‌ড্‌ সেলের অভ্যন্তরে বসে লিখেছিলেন :

'…অব্‌ না অগ্‌লে ওয়ল্‌লে হ্যায় আউর
না আর্‌মানোকী ভীড়।
সির্‌ফ মর্‌ মিট্‌নেকি হস্‌রৎ আপ্‌
দিলে এ বিস্‌মিল্‌ মেঁ হ্যায়॥'

কে এই বিসমিল? কি তাঁর পরিচয়?

কেন তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল ফাঁসির মঞ্চে?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের বেশ কিছুদিন পিছিয়ে যেতে হবে কল্যাণী।

১৯১৫ সন। উত্তর প্রদেশের বৈপ্লবিক সংস্থা তখন ভাঙনের মুখে।

কারণ—বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা। এ মামলায় বহু বিপ্লবী তরুণকেই দেয়া হয়েছে দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড। উপযুক্ত কর্মীর অভাবে স্বভাবতঃই পার্টির তখন ভগ্নদশা।

মাথা তুলে দাঁড়ালেন গোয়ালিয়রের তরুণ বিপ্লবী বিসমিল। না, পিছিয়ে গেলে হবে না। আবার বৈপ্লবিক সংস্থা গড়ে তুলতে হবে নতুন করে।

কিন্তু অর্থ পাওয়া যাবে কোথায়। অস্ত্রশস্ত্র কিনতে হলে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

অর্থের প্রয়োজনে ক্রমে ক্রমে দুখানি গ্রন্থ রচনা করলেন বিসমিল। 'আমেরিকার স্বাধীনতা' আর 'দেশবাসীর প্রতি আবেদন।' দেখা যাক, এই বই বিক্রি করে কিছু পাওয়া যায় কিনা।

অল্পদিনের মধ্যেই বই দুটি জনপ্রিয় হল জনসাধারণের কাছে। অর্থও পাওয়া গেল কিছু কিছু। তারপরই রাজরোষ। না, এ বই চলবে না। আজ থেকে এ বই বাজেয়াপ্ত।

চুপ করে বসে রইলেন না বিসমিল। সেই বই বিক্রির টাকা দিয়েই তিনি কয়েকটা রিভলবার সংগ্রহ করলেন গোয়ালিয়র থেকে। যাক, অস্ত্র হাতে এসে গেছে। এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত।

খবরটা অজানা রইল না পুলিসের। অত্যন্ত চাতুর্য্য সহকারে তারা একটি গুপ্তচরকে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হল বিসমিলের দলে। খুব সাবধানে থেকো বিসমিলের পাশে পাশে। আর কখন কি হয়, আমাদের জানিয়ে দিয়ো।

ওদিকে বিসমিলের মাথায় তখন নতুন পরিকল্পনা। মৈনপুরার একটি জমিদারের গৃহে অনেক নগদ টাকা গচ্ছিত রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। যে করে হোক, ঐ টাকাটা সংগ্রহ করে পার্টির কাজে লাগাতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল পুলিসের কাছে। বিসমিল নির্দ্দিষ্ট দিনেই হানা দেবে মৈনপুরার সেই জমিদারের গৃহে। তখন তাকে গ্রেপ্তার করা যেতে পারে।

কোথায় বিসমিল! কোথায় কি! একে একে সবাই ধরা পড়লেন পুলিসের বেড়াজালে, শুধু ধরা গেল না বিসমিলকে। কি করে যে তিনি ছিটকে বেরিয়ে গেলেন, পুলিস তার কোন হদিসই পেল না।

কিছুদিনের মধ্যেই আবার তৎপর হয়ে উঠলেন বিসমিল।

সহকর্মীরা সবাই বন্দী, তা বলে হতাশ হলে চলবে কেন! আবার দল গঠনের কাজে লাগতে হবে নতুন করে। কোন কিছুতেই হার মানলে চলবে না।

ওদিকে পুলিস তখন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিসমিলের খোঁজে। যে করে হোক, বিসমিলকে চাইই।

মজা হল কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশনে।

হঠাৎ কি দেখে সবাই অবাক। পুলিস! পুলিস! পুলিস! কিন্তু পুলিস কেন! কি চায় ওরা এখানে?

চাই বিসমিলকে। আমরা জানি এখানেই সে রয়েছে।

না, এবারও তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। অথচ কিছুক্ষণ আগেও তাঁকে এখানে দেখা গিয়েছিল ঘোরাঘুরি করতে।

খোঁজ পাওয়া গেল শাহজাহানপুরের কাছাকাছি একটা ছোট শহরে। একেবারে পাকা খবর। কোথাও ভুল নেই।

না, হল না। এবারও পুলিসকে ফিরে যেতে হল মুখ কালো করে। আশ্চর্য্য! কি করে যে লোকটা আগে থেকেই সব টের পায়, কে জানে।

বিসমিলের নাগাল না পেয়ে এবার সমস্ত আক্রোশ গিয়ে পড়ল তাঁর পিতার উপর। ফলে সরকারী নির্দেশে সমস্ত সম্পত্তি হারিয়ে তাঁকে হতে হল পথের ভিখারী।

১৯২২ সনে পরিচয় হল প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক যোগেশ চ্যাটার্জীর সঙ্গে। দুজনেই চিনলেন দুজনকে।

যোগেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে সমগ্র উত্তর প্রদেশের বৈপ্লবিক সংস্থার প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন বিসমিল। সহকারী হিসেবে সঙ্গে রইলেন আসফাকুউল্লা।

কিন্তু বৈপ্লবিক কাজ চালাতে হলে উপযুক্ত অস্ত্র-শস্ত্র চাই। তা সংগ্রহ করতে হলে সর্বাগ্রে চাই প্রচুর টাকা। কারণ সব কিছুই সংগ্রহ করতে হবে গোপনে, পুলিসের দৃষ্টির আড়ালে। তার জন্য

স্বাভাবিক মূল্যের চাইতেও আরো অনেক বেশি টাকার প্রয়োজন।

কোথা থেকে আসবে এত টাকা? এ তো আর ছু-দশ টাকার ব্যাপার নয়। অনেক টাকা চাই যে।

ঠিক হল, টাকা লুঠ করতে হবে। সাধারণ মানুষের টাকা নয়, সরকারী টাকা। তা ছাড়া কোন উপায় নেই।

১৯২৫ সন। ৯ই আগস্ট।

রাত তখন অনেক। যাত্রী গাড়ীটা কাকোরী ষ্টেশন ছাড়িয়া দৈত্যের মত ছুটে চলেছে আলমনগরের দিকে।

হঠাৎ একি! মাঝ পথে থেমে গেল কেন গাড়ীটা! মনে হয় কে যেন চেন টেনেছে। কি ব্যাপার!

নিমেষে দশ এগারোটা বিপ্লবী তরুণ গার্ডের কামরায় গিয়ে হাজির। যে যেখানে আছ, চুপ করে বসে থাকো। ভয় নেই, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না। শুধু ঐ টাকার সিন্দুকটা তুলে নিয়ে যাব। বাধা দেবার চেষ্টা করে লাভ নেই। আমাদের কাজ আমরা করবই।

ছু-একজন অতি-উৎসাহী লোক কিন্তু এই সাবধান-বাণীতে কান দিল না কল্যাণী, ফলে মুহূর্তে তাদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র আগুন ছড়াল—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

খবর শুনে হৈ-চৈ পড়ে গেল শাসক-মহলে। বলে কি! একে সরকারী টাকা লুঠ, তার উপর কিনা নরহত্যা! মহামান্য ইংরেজ সরকারের রাজত্বে এমন কথা যে চিন্তাই করা যায় না। নাঃ! যে করেই হোক, ওদের ধরতেই হবে।

কিন্তু কাকে ধরবে! আসামী কোথায়! না, কারোরই কোন খোঁজ নেই।

খোঁজ পাওয়া গেল প্রায় মাসাধিক কাল বাদে, শাহজাহানপুরে। পাওয়া গেল কয়েকটি নম্বরযুক্ত সরকারী নোট, যা সেদিন লুণ্ঠিত হয়েছিল যাত্রী গাড়ীতে। এ নোট এখানে কি করে এল ?

আর ইন্দুভূষণ বিশ্বাস নামে ঐ বাঙালী ছেলেটি এখানে কেন! ওর নামে এত চিঠিই বা আসে কোথা থেকে!

পোষ্ট অফিসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ওর চিঠিগুলি খুলে দেখা দরকার।

ফল হল আশাতীত। দেখা গেল বাইরে ইন্দুভূষণ বিশ্বাসের নাম থাকলেও আসলে বেশির ভাগ চিঠিই বিসমিলকে উদ্দেশ্য করে লেখা। লিখেছেন তারই বিভিন্ন সহকর্মীগণ। যাত্রীগাড়ী থেকে অর্থ সংগ্রহের সব কিছু বিবরণই তার মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার ভাবে।

চিঠি থেকে আরও জানা গেল যে, দলের অন্যতম নেতা রাজেন লাহিড়ী উত্তর প্রদেশে নেই। বোমা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেদিনই তিনি রওয়ানা হয়ে গেছেন কলকাতায়।

২৬শে নভেম্বর শেষ রাত্রে বিসমিল ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিক ভাবে। সঙ্গে পাওয়া গেল কয়েকটি জরুরী চিঠি, যা তারপক্ষে ছিল খুবই মারাত্মক।

শাহজাহানপুর থেকে ধরা হল ঠাকুর রোশন সিংকে। এলাহাবাদ থেকে ধরা পড়লেন শচীন সান্যাল। রাজেন লাহিড়ীকে ধরা হল দক্ষিণেশ্বরের একটা বোমার আড্ডা থেকে। দলনেতা যোগেশ চ্যাটার্জী তখন বাংলা দেশে। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করে তাঁকেও এবার নিয়ে আসা হল উত্তর প্রদেশে।

অসফাকুউল্লা ধরা পড়েছিলেন প্রায় একবছর বাদে। সেকথা পরে আসবে।

একমাত্র ব্যতিক্রম দুর্ধর্ষ বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ। হাজার চেষ্টা করেও পুলিস তাঁর কোন সন্ধান পায়নি। পরবর্তী কাজ,—ভগৎ সিং

এর সহকর্মীরূপে স্যাণ্ডার্স হত্যায় অংশ গ্রহণ। সেদিনও পুলিস তাকে কোনমতেই পারেনি গ্রেপ্তার করতে।

পেরেছিল ১৯৩১ সনে এলাহাবাদের এ্যালফ্রেড পার্কে। তবে তাঁকে নয়, তাঁর প্রাণহীন দেহটাকে।

১৯২৬ সনের ৪ঠা জানুয়ারী শুরু হল ঐতিহাসিক কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা।

আসামী মোট চুয়াল্লিশ জন। রাজসাক্ষী—দুজন। বেনারসী লাল কাকস্ আর ইন্দুভূষণ মিত্র।

প্রথম পর্য্যায়ের শুনানী চলল মোট পঁয়ষট্টি দিন। সাক্ষী—২৪৭ জন।

রায় দেয়া হল—১৯২৭ সনের ৬ই এপ্রিল।

রামপ্রসাদ বিসমিল, ঠাকুর রোশন সিং আর রাজেন লাহিড়ী—তিনজনকেই দেয়া হল প্রাণদণ্ড। অপরাধ—মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টা—বৈপ্লবিক উপায়ে সরকারের উচ্ছেদ সাধনের ষড়যন্ত্র এবং ট্রেন ডাকাতি ও নরহত্যা।

বাকী সবাইকে দেয়া হল দীর্ঘ মেয়াদী কারাদণ্ড। তাঁদের মধ্যে বানোয়ারী লাল—পাঁচ বছর। গোবিন্দচরণ কর—দশ বছর। ভূপেন্দ্র নাথ সান্যাল—পাঁচ বছর, মুকুন্দলাল— দশবছর, যোগেশ চ্যাটার্জী—দশ বছর। মন্মথ গুপ্ত—চৌদ্দ বছর। প্রেমকিষণ খান্না—পাঁচ বছর। প্রণবেশ চট্টোপাধ্যায়—পাঁচ বছর। রাজকুমার সিংহ—দশ বছর। রামদুলাল ত্রিবেদী—পাঁচ বছর। রামকিষণ ক্ষেত্রী—দশ বছর। শচীন্দ্র নাথ সান্যাল—যাবজ্জীবন দীপান্তর। সুরেশ ভট্টাচার্য—সাত বছর। বিষ্ণুশরণ দুবলিস্—সাত বছর।

মুক্তির আদেশ পেলেন জ্যোতিশঙ্কর দীক্ষিত, বীরভদ্র তেওয়ারী, হরগোবিন্দ, আর শচীন বিশ্বাস। সেই সঙ্গে দুজন বিশ্বাসঘাতক রাজসাক্ষী, বেনারসীলাল, আর ইন্দুভূষণ মিত্র।

মামলার রায় দেবার পরে ধরা পড়লেন আসফাকুউল্লা আর শচীন্দ্রনাথ বক্সী। আসফাকুউল্লা ধরা পড়লেন ১৯২৬ সনের ৮ই সেপ্টেম্বর। শচীন্দ্রনাথ বক্সীকে গ্রেপ্তার করা হল বেনারস থেকে।

সঙ্গে সঙ্গেই বিচার। বিচারে আসফাকুউল্লাকেও দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। শচীন্দ্রনাথ বক্সীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

তিনজন ব্যতীত বাকী সবাই আপীল করলেন অযোধ্যা চীফ কোর্টে।

ফল হল মারাত্মক। ফাঁসির হুকুমের এতটুকুও রদবদল হলনা। হল অন্যান্যদের বেলায়। সেখানে যোগেশ চ্যাটার্জী, গোবিন্দ কর, ও মুকুন্দলালকে দশ বছরের জায়গায় দণ্ড বৃদ্ধি করে দেয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। সুরেশ ভট্টাচার্য্য ও বিষ্ণুশরণকে সাত বছরের পরিবর্তে দশ বছর। কিছু হ্রাস করা হল রামনাথ পাণ্ডে ও প্রণবেশ চ্যাটার্জীর বেলায়। তাঁদের দণ্ড কমিয়ে করা হল যথাক্রমে তিন বছর ও চার বছর।

তুমুল আন্দোলন শুরু হল উত্তর প্রদেশে। বিসমিল, রোশন সিং, আসফাকুউল্লা ও রাজেন লাহিড়ীর প্রতি এই অন্যায় আদেশ আমরা কিছুতেই সহ্য করবোনা। আমরা সত্যিকারের বিচার চাই।

একই অভিমত প্রকাশ করলেন আইন সভার ভারতীয় সদস্যগণ। এ আদেশ বেআইনী। আমরা এর প্রতিকার চাই।

এমনকি উত্তর প্রদেশের বিশিষ্ট নাগরিকগণ পর্য্যন্ত আবেদন জানালেন গভর্ণরের কাছে। ওদের ফাঁসির হুকুম রদ করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হোক। এটাই আমাদের একমাত্র অনুরোধ মহামান্য সরকার বাহাদুরের কাছে।

গভর্ণর রাজী না হওয়াতে দেশবাসীর উদ্যোগে এবার আপীল করা হল বিলেতের প্রিভি কাউন্সিলে। বন্দীদের ফাঁসির হুকুম রদ করা হোক।

কিছুতেই কিছু হলনা। এবার পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও

কেন্দ্রীয় আইন সভার কয়েকজন দেশবরেণ্য নেতা আবেদন জানালেন বড়লাটের কাছে। ওদের ফাঁসির হুকুম রদ করে জনমতের প্রতি আস্থা দেখানো হোক। ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিলে তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেসে যাবেনা আশাকরি।

বড়লাট অটল, অনড়। না, আমার কিছু করার নেই। যা হুকুম দেয়া হয়েছে তাই হবে।

শেষ পর্য্যন্ত আবেদন জানানো হল মহামান্য সম্রাটের কাছে। আমরা দেশবাসীর পক্ষ থেকে ওদের প্রাণভিক্ষা চাইছি মহামান্য ভারত সম্রাটের কাছে। দয়া করে ওদের ফাঁসির হুকুম রদ করুন!

ফল দাঁড়াল সেই একই। অর্থাৎ—কোন দয়া নয়। কোন অনুকম্পা নয়। ফাঁসির হুকুম বহাল রইল ওদের চারজনের।

যথাসময়ে বিসমিল, রাজেন লাহিড়ী, ঠাকুর রোশন সিং ও আসফাকুউল্লাকে ভিন্ন ভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দেয়া হল সরকারী নির্দেশে।

আসফাকুউল্লা সাহজাহানপুরের এক সম্ভ্রান্ত পাঠান পরিবারের ছেলে। যেমন চেহারা, তেমনি বলিষ্ঠ গঠন। স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে ভরপুর যৌবনের একটি উজ্জ্বল শিখা যেন। তাঁকে রাখা হল ফৈজাবাদ জেলে।

সত্যই অদ্ভুত ছেলে ছিলেন আসফাকুউল্লা। অগ্নিযুগের প্রথম মুসলীম শহীদ হবার আনন্দে গর্বের আর বুঝি সীমা-পরিসীমা ছিল না তাঁর। এমনি একটা লগ্নের অপেক্ষায়ই বুঝি তিনি উন্মুখ হয়ে ছিলেন সারা জীবন।

ফাঁসির পূর্বে আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্যে লিখিত চিঠিপত্রেও তাঁর সেই একই কথা।

দেশের মুক্তির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার সুযোগ পেয়েছি বলে আমি গর্বিত।

ব্যক্তিগত জীবনে আসফাকুউল্লা ছিলেন রীতিমত একজন

সুগায়ক এবং সুরসিক। এমন কি ফাঁসির পূর্বেও তাঁর সেই সরস কৌতুকের ভাণ্ডার কোনদিনও শুকিয়ে যায়নি।

এমনি একদিনের কথা। হঠাৎ সেদিন জেলার সাহেব আসফাক্‌-উল্লাকে লক্ষ্য করে বললেন :

—আশ্চর্য ব্যাপার! যত দিন যাচ্ছে, তত দেখছি তোমার দেহের ওজন বেড়েই চলেছে।

—তাই বুঝি! সকৌতুকে জবাব দিলেন আসফাক্‌উল্লা, তা হলে এ ব্যাপারে ফার্স্ট প্রাইজটা আমারই পাওয়া উচিত বলুন।

—না, তোমার প্লেস হল সেকেণ্ড। কারণ জেল-রেকর্ডে দেখা যাচ্ছে যে, এখনো একজন তোমার উপরে রয়ে গেছে।

—কি আপসোস! অল্পের জন্য একটা রেকর্ড করে যেতে পারলাম না। ঠিক আছে, এখনো তো দিন কয়েক বাকী আছে। এর মধ্যে ঠিক মেকআপ করে ফেলব।

ঠাকুর রোশন সিংয়ের জন্ম সাহজাহানপুরের এক প্রসিদ্ধ জমিদার বংশে। তাঁর স্থান হল নৈনি জেলে।

রাজেন লাহিড়ী কাশী বিশ্ববিস্তালয়ের এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। তাঁকে পাঠানো হল গোণ্ডা জেলে।

গোয়ালিয়র-নিবাসী রামপ্রসাদ বিসমিলের স্থান হল গোরখপুর জেলে। এই জেলে বসেই মৃত্যুপথযাত্রী বিসমিল সেদিন লিখেছিলেন তাঁর সেই অবিস্মরণীয় সঙ্গীত :

'সর্‌ ফরোশী কি তমন্না অব্‌ হমারে
দিল মেঁ হ্যায়
দেখ্‌না হ্যায় জোর্‌ কিত্‌না বাজুএ
কাত্তিল্‌ মে হ্যায়।'

শুধু বিসমিল নয়, জেলের সবাই, এমন কি সাধারণ কয়েদীদের মুখে পর্য্যন্ত সেদিন সেই একই গান :

'অব্ না অগ্‌লে ওয়ল্‌লে হ্যায় আউর
না আরমানোকী ভীড়।
সির্‌ফ্ মর্ মিট্‌নে কি হস্‌রৎ আপ্
দিলে এ বিস্‌মিল্ মেঁ হ্যায়।'

শুধু গান—গান—আর গান। গান ছাড়া সেদিন আর কিছুই বুঝি অবশিষ্ট ছিল না বিসমিলের জীবনে। এমন করে যায় যদি দিন যাক না। আর ক'দিনই বা।

তবু মাঝে মাঝে মনটা বুঝি একটু উদাস হয়ে যায়। যায় মায়ের কথা ভেবে। এতবড় আঘাতটা স্নেহময়ী মা সইবেন কি করে! বিসমিল যে তাঁর বড আদরের। তাঁকে একমুহূর্ত চোখের আড়াল হতে দিতেও যে কোনদিন তাঁর মন সরেনি।

ভুল কল্যাণী, একেবারেই ভুল। বাইরে স্নেহময়ী হলেও আসলে তিনি যে কতবড় শক্তিময়ী ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল বিসমিলের ফাঁসির আগের দিন।

সেদিন বিসমিলের বাবা-মা তুজনেই এসেছেন ছেলেকে শেষ দেখা দেখতে। ভোর-রাত্রেই তাঁর ফাঁসি হবে। সুতরাং এই শেষ দেখা।

কথা বলতে বলতে মায়ের কথা ভেবে হঠাৎ সেদিন একসময়ে চোখ তুটো জলে ভরে এল বিসমিলের। মা! মা গো! তুমি যেন তুঃখ পেয়ো না আমার কথা ভেবে।

ভুল ভাঙল অচিরেই। স্পষ্ট, দৃঢ়স্বরে মা জবাব দিলেন :

—না না, তোমাকে আমি এভাবে দেখতে চাইনে বিসমিল। তুমি আমার বীর সন্তান। দেশের জন্য বীরের মতই তুমি মাথা উঁচু করে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করবে, তাই আমি চাই।

—তুমি আমাকে ভুল বুঝো না মা। অদ্ভুত একটা আনন্দে

নিমেষে মনের মণিকোঠা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল বিসমিলের, আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম, নিজের কথা নয়। বিশ্বাস কর, নিজের মৃত্যুর জন্য আমি এতটুকুও দুঃখিত নই। দেখো না, আমি কেমন হাসছি তোমার দিকে চেয়ে। ভাল করে চেয়ে দেখ।

শীতের সন্ধ্যা। দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এল অন্ধকারের যবনিকা।

বাবা-মা চলে গেছেন অনেকক্ষণ। আর কোন কাজ নেই। কেবল অপেক্ষা। শেষ বিদায়ের আগে কয়েকটা অলস মন্থর মুহূর্ত। সেগুলো পার হবার জন্য এক ক্লান্তিকর প্রতীক্ষা।

সহসা সেই অন্ধকারের মধ্য থেকে শোনা গেল সেই অমর সঙ্গীত :

সর্ ফরোশী কি তমন্না অব্ হমারে
দিল্ মেঁ হ্যায়।
দেখ্না হ্যায় জোর্ কিত্না বাজু এ
কাতিল মেঁ হ্যায়।

[এখন আমার মনে মৃত্যুকে স্পর্শ করার ভাবনা। দেখতে চাই ঘাতকের বাহুতে কত বল আছে]

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯২৭ সন।

পূর্ব আকাশে রঙ ধরেছে। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে একটু একটু করে।

বিসমিল ঘুমে অচেতন। সারা মুখে তাঁর নিরুদ্বেগ জীবনের সুপ্ত প্রশান্তি। কোথাও তার মধ্যে এতটুকু মালিন্য নেই।

সহসা কি শুনে ঘুম ভেঙে গেল বিসমিলের।

তালে তালে পা ফেলে কারা যেন এগিয়ে আসছে। স্পষ্ট তাদের পায়ের শব্দ ভেসে আসছে—গট্‌গট্—গট্‌গট্—গট্ গট্...

দেখতে দেখতে সারা মুখে একটুকরো রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল বিসমিলের। এ সময়ে কারা যে অমন করে এগিয়ে আসছে সে কথা তাঁর অজানা নয়। লগ্ন সমাগত। এবার যেতে হবে।

সহকর্মী রাজেন লাহিড়ী দুদিন আগেই (১৭ই ডিসেম্বর) চলে গেছে। আজ তার যাবার পালা।

একই দিনে, একই সময়ে যেতে হবে সহকর্মী আসফাক্উল্লাকে। তাকে যেতে হবে ফৈজাবাদ জেল থেকে।

ঠাকুর রোশন সিংকে যেতে হবে আরো দুদিন পরে। ২১শে ডিসেম্বর। নৈনি জেল থেকে।

দৃঢ় পদক্ষেপে বধ্যমঞ্চের দিকে যেতে যেতে শেষবারের মত বিসমিলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল সেই অপূর্ব সঙ্গীত-লহরী :

'অবনা অগ্‌লে ওয়ল্‌লে হ্যায় আউর
না আরমানোকী ভীড়
সির্‌ফ্ মর্ মিটনেকি হসরৎ আপ্
দিলে এ বিসমিল্ মেঁ হ্যায়।'

[সমস্ত কলগুঞ্জন থেমে গেছে। মিটে গেছে সকল বাসনা। এখন শুধু মৃত্যুকে বরণ করার কামনা বিসমিলের হৃদয়ে বিরাজিত।]

বিসমিলের কণ্ঠ স্তব্ধ হল, তা বলে তাঁর সেই গান কিন্তু এখানেই থেমে গেল না কল্যাণী। এবার একই সঙ্গে সুর মেলালেন জেলের অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দী ও সাধারণ কয়েদীর দল। তাঁদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়ে উঠল সেই একই সঙ্গীত :

'সির্‌ফ্ মর্ মিটনে কি হসরৎ আপ্
দিলে এ বিসমিল মেঁ হ্যায়॥'

সে সুর মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তরে। সেখানেও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠে সেই একই গান :

'সির্‌ফ্ মর্ মিটনে কি হসরৎ আপ্
দিলে এ বিসমিল মেঁ হ্যায়॥'

দীর্ঘ সাত বছর বাদে সেই একই গান আবার শোনা গেল গয়া সেণ্ট্রাল জেলের গানের জলসায়।

কিন্তু সেই শেষ। তারপর আর শোনা যায়নি। দেশ আজ স্বাধীন হয়েছে। তাই বৈকুণ্ঠ-বিসমিলদের প্রয়োজনও আজ ফুরিয়ে গেছে।

কে তাঁদের চেনে?

কে তাঁদের জানে?

ক'জন তাঁদের নাম শুনেছে?

শুনেছে কি কেউ? কে জানে!

দোষ তোমাদের নয় কল্যাণী, আমাদের। আমরাই তোমাদের এতদিন ওদের কথা জানতে দিইনি। কারণ আমাদের নীতিই হল—নেতিবাদ।

সোজা কথায়, কেউ আমাদের গালে এক চড় দিলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা আর এক গাল পেতে দেব, তবু প্রত্যাঘাত কিছুতেই নয়।

তা করতে গেলে গোটা বিশ্বের কাছে নাকি আমরা আদর্শভ্রষ্ট হব। সুতরাং তেমন কাজ আমরা কিছুতেই করতে পারি নে।

ওদের নীতি, ঠিক তার বিপরীত। দেশের জন্য ওরা মারতেও জানে, মরতেও জানে।

প্রমাণ—ইতিহাস। বুকের পাঁজরে পূজার হোমানল জ্বেলে, দুঃখের সঙ্গে সংগ্রাম করে, মৃত্যুকে তুচ্ছ করে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরব্যাপী যে ইতিহাস ওরা সৃষ্টি করে গেছে, তাকে অস্বীর করার সাধ্য কোথায়?

আপত্তি সেইখানেই। শুধু আপত্তি নয়, ভয়ও। তাই তো ওদের পরিচয় আমরা তোমাদের কাছে লুকিয়ে রেখেছি অতি সন্তর্পণে।

কে জানে, ওদের আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে একদিন আমাদের বিরুদ্ধেই যদি তোমরা রুখে দাঁড়াও?

না, তা আমরা হতে দিতে পারি নে। তার চাইতে যা চাপা আছে, তা চাপাই থাক।

তবু যে আজ সেই বিস্মৃতপ্রায় অগ্নিযুগের কথা বলতে শুরু করেছি, তার একমাত্র কারণ—তুমি।

ওদের কথা শুনতে চেয়ে বার বার তুমি আমাকে তাগিদ দিয়েছ। বার বার তোমার দাবী জানিয়েছ। তোমার এই ঐকান্তিক দাবীকে উপেক্ষা করি কি করে বল?

তবে দেখ, এ কাহিনী শোনার পরে সঙ্গে সঙ্গেই মন থেকে ওদের কথা মুছে ফেলতে ভুলে যেও না যেন। কি লাভ ওদের মনে রেখে। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ওরা তো কতগুলি অপাংক্তেয়, ফসিল মাত্র।

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি……'

এবার শোন ক্ষুদিরামের সেই গানের কথা, যে গান আজো অমর, অক্ষয় হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়।

তবে গানটা কিন্তু ক্ষুদিরামের লেখা নয়। লিখেছিলেন তখনকার সময়ের একজন অজ্ঞাত পরিচয় পল্লীকবি, যার নামটা অজ্ঞাতই রয়ে গেছে চিরদিন।

ক্ষুদিরাম। ছোট্ট একটি নাম। এই নামটার পেছনে কিন্তু অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে কল্যাণী। এ সম্বন্ধে ক্ষুদিরামের দিদি শ্রদ্ধেয়া অপরূপা দেবী পরবর্তীকালে কি বলেছেন শোন:

"ছিয়ানব্বই সালের উনিশে অঘ্রাণ মঙ্গলবার। তখন সন্ধ্যে পাঁচটা হবে, ক্ষুদিরামের জন্ম হ'ল। সেদিন কি আনন্দ আমাদের।

এর আগে পরপর দুটো ভাই মারা গেছে, আর আমরা বাঙালী ঘরে অভিসম্পাত নিতে তিন তিনটে বোন অজর—অমর হয়ে বেঁচে রইলাম—এ লজ্জা রাখবার যেন ঠাঁই পাচ্ছিলাম না। তাই ছোট ভাইটি যখন হ'ল কি আনন্দ আমাদের।

নবজাতক ভাইটিকে আমি কিনে নিলাম তিন মুঠো খুদ দিয়ে।

আমাদের এদিকে একটা সংস্কার আছে, পরপর কয়েকটি পুত্র সন্তান মারা গেলে মা তার কোলের ছেলের সমস্ত লৌকিক অধিকার ত্যাগ করে বিক্রি করার ভান করেন। যে কেউ কিনে নেন কড়ি দিয়ে, নয়ত খুদ দিয়ে।

তিনটি কড়ি দিয়ে কিনলে নাম হয় তিনকড়ি। পাঁচ কড়ি দিয়ে কিনলে নাম হয় পাঁচকড়ি। তিন মুঠো খুদ দিয়ে কিনলাম বলে ভাইটির নাম হল ক্ষুদিরাম।"

একটি মাত্র ভাই। সন্তানসম সেই ভাইটিকে কি ভালই না বাসতেন দিদি অপরূপা দেবী। ক্ষুদিরাম জন্মাবার কিছুদিন পরেই শ্বশুর-ঘর দাসপুর থানার হাট গেছ্যা গ্রামে চলে যেতে হয় আমাকে।

"তারপরে কয়েকটা বছর কেটে গেছে। কিন্তু যখনই বাপের বাড়ী থেকে শ্বশুর বাড়ীতে যাবার সময় হোত; তখনই সেই ফর্সা, লিক্‌লিকে ক্ষুদিরাম মাথায় এক মাথা ঠাকুরের জন্য রাখা চুল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত কোলে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরত গলা, কিছুতেই যেতে দেবে না আমাকে।

আর এমনই কাঁদত যে তার হাতের বাঁধন থেকে ছাড়িয়ে চলে যাওয়ার পর বহুক্ষণ আমাকে কাঁদতে হোত।

ক্ষুদিরামের জন্মের পর এক বছর আট মাস পরে আমার বড় ছেলে ললিত হয়। মামা ও ভাগ্নের মধ্যে এই অল্প বয়সের ব্যবধানকে ওরা কেউই মানত না, তাই মামা ও ভাগ্নের মধ্যে সাথীত্বের সম্বন্ধটাই হয়েছিল বেশী।

মামাকে যখন শাসন করতে গেছি, ভাগ্নে তখন নিজের ছোট লেপটিতে মামাকে লুকিকে রেখেছে, আর এমন ভাবে লুকিয়ে রেখেছে, যাতে দুই জনকেই না মেরে পারা যায় না। কাজেই আমাকে হার মানতে হোত ওদের কাছে।"

[স্বাধীনতা : ২১. ৭. ৪৭]

ক্ষুদিরামকে চিনতে হলে আমাদের অনেকগুলি দিন পিছিয়ে যেতে হবে কল্যাণী। যেতে হবে কলকাতা থেকে অনেক দূরে, মজঃফরপুরে।

১৯০৮ সন। ৩০শে এপ্রিল। বৃহস্পতিবার।

অমাবস্যার রাত। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তু'হাত দূরের জিনিষও স্পষ্ট দেখা যায় না।

সামনেই ইয়োরোপীয়ান ক্লাব। বাইরে অন্ধকারের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে তুটি তরুণ যুবক। চোখে মুখে তাদের অধীর প্রতীক্ষা।

কোন কথা নয়। কোন কাজ নয়। শুধু প্রতীক্ষা। স্তব্ধ প্রতীক্ষা ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই।

ক্লাব ঘরের আলোঝলমল কক্ষে তখন উৎসবের বন্যা। শুধু নাচ আর গান। সুরা আর নারী।

ওরা নির্বিকার। এই উচ্ছৃসতার সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই।

কেটে গেল আরো কয়েক মিনিট। তখনো ভেতরে নাচ গান চলেছে সে একই ভাবে।

আবার সেই প্রতীক্ষা। কখন বেরিয়ে আসবে কুখ্যাত জেলাজজ মিঃ কিংসফোর্ড। আজ তার শেষ দিন। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্যায় ভাবে শাস্তি দেওয়া, বিশেষ করে বিপ্লবী বালক সুশীল সেনকে বেত্রদণ্ড দেবার প্রতিফল আজ তাকে পেতেই হবে।

দূরে কোথায় পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত আটটা বাজতেই সজাগ হয়ে উঠলেন ওরা তুজন।

লগ্ন সমাগত। রোজই এ সময়ে সে বেরিয়ে আসে ক্লাব ঘর থেকে। কোনদিন তার ব্যতিক্রম হয়নি। আজো হবেনা।

ঐ—ঐ যে তার ফিটন গাড়ীটা বেরিয়ে আসছে ক্লাব ঘরের গেট দিয়ে। আর দেরী নেই। এল বলে।

নিমেষে প্রস্তুত হয়ে নিলেন ওরা দুজন। এসেছে! এসেছে! জীবনের পরমলগ্ন এগিয়ে এসেছে। এ সুযোগ হারালে চলবেনা।

জিরো আওয়ার। রেডি। অ্যাকসন প্লীজ। ওয়ান—টু—থ্রি...

বুম্-ম্-ম্-ম!

নিমিষে গোটা মজঃফরপুর শহরটা কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে। কেঁপে উঠল পররাজ্য লোভী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্ত বুনিয়াদ।

কি হল কিছুই বোঝা গেলনা। কিছুই দেখা গেলনা। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। সব কিছুই ঢাকা পড়ে গেল নিচ্ছিদ্র কালো ধোঁয়ার অন্তরালে।

গাড়ীটা কিন্তু আসলে কিংসফোর্ডের নয় কল্যাণী, ব্যারিষ্টার মিঃ কেনেডির।

অন্ধকারে ওরা কেউ তা বুঝতে পারেননি। বুঝতে পেরেছিলেন অনেক পরে। তখনই ওরা প্রথম জানতে পেরেছিলেন যে বোমা বিস্ফোরণের ফলে কিংসফোর্ড নিহত হননি, হয়েছেন মিসেস্ কেনেডি আর মিস্ কেনেডি।

মিস্ কেনেডি মারা গেলেন সেই রাত্রেই। মিসেস্ কেনেডি—আট ঘণ্টা বাদে।

ওদিকে বোমা নিক্ষেপ করেই ওরা দুজন অনির্দেশ ভাবে ছুটে চলেছেন রেল লাইন ধরে। খবরটা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং সর্বাগ্রে পুলিস বেষ্টনী ভেদ করে দূরে সরে যাওয়া প্রয়োজন।

ওরা দুজন। ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকী।

কেউ কারো পরিচয় জানে না। ইচ্ছা করেই জানানো হয়নি। কারণ—'মন্ত্রগুপ্তি'।

ক্ষুদিরামকে বলা হয়েছিল—তোমার সঙ্গীর নাম দীনেশ রায়। অপর পক্ষে প্রফুল্ল চাকীর ধারণা তার সঙ্গীটি হরেন সরকার ছাড়া আর কেউ নন।

সারারাত্রি একটানা হেঁটে পরদিন ভোরে চব্বিশ মাইল দূরবর্তী ওয়াইনী রেল ষ্টেশন।

ক্ষুধা তৃষ্ণা ও পথশ্রমে কিশোর ক্ষুদিরাম তখন রীতিমত কাতর। অবসাদে সারা দেহ ভেঙে পড়তে চাইছে। পা যেন আর চলতেই চাইছেনা।

সহসা কি দেখে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্ষুদিরামের। ঐতো দূরে ষ্টেশনের গায়ে একটা মুদি দোকান রয়েছে। ওখানে কিছু খাবার-টাবার পাওয়া যাবে না! দেখাই যাকনা একবার চেষ্টা করে।

অদূরে দাঁড়িয়ে খৈনি টিপছে দুজন কনেষ্টবল—ফতে সিং আর শিবপ্রসাদ মিশ্র। ক্ষুদিরামকে দেখেই কিসের যেন একটা ইঙ্গিত খেলে গেল তাদের চোখের তারায়।

কে এই ছেলেটি?

ওর সারা গায়ে ধূলোবালি ভর্তি কেন?

মনে হয় অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। তা ছাড়া বেশ পরিশ্রান্তও বটে।

নাঃ! এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা একবার দেখতে হয়।

পুলিস দেখেই বিদ্যুৎবেগে কোমরে হাত দিলেন ক্ষুদিরাম, কিন্তু সব বৃথা। তার আগেই ফতে সিং আর শিবপ্রসাদ গুপ্ত তাঁকে জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন।

প্রফুল্ল তখনো নিরাপদ। হাঁটতে হাঁটতেই এক সময়ে তিনি পৌঁছে গেলেন বত্রিশ মাইল দূরবর্তী সমস্তিপুর।

সামনেই রেল কোয়ার্টার। তারই একপাশ দিয়ে পায়ে পায়ে তিনি এগিয়ে চললেন ষ্টেশনের দিকে।

বাধা দিলেন একটি বাঙ্গালী যুবক। না, এখন যাবেন না ওদিকে।

সময় হলে আমিই আপনাকে তুলে দিয়ে আসবো গাড়ীতে। আমার সঙ্গে আসুন।

তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিলেন প্রফুল্ল। কে এই যুবকটি! কি ওর মতলব!

কিন্তু না। যুবকটির বড় বড় দুটি চোখে সহজ সরল আন্তরিকতা ছাড়া আর কিছুই নেই। ওকে বিশ্বাস করা চলে।

—দেরী করবেন না। আসুন আমার সঙ্গে।

মনে মনে হাসলেন যুবকটি। মুখে কোনরকম কৌতূহল না দেখালেও প্রফুল্লর আসল পরিচয় অনুমান করে নিতে তার এতটুকুও দেরী হয়নি। একজন বাঙ্গালী হিসেবে দেশের মুক্তিকামী এই যুবককে সহায়তা করা তার কর্তব্য।

প্রথমেই যুবকটি তাড়াতাড়ি একপ্রস্থ নতুন জামা কাপড় ও জুতো কিনে নিয়ে এলেন প্রফুল্লর জন্য। পুলিস ওঁর সম্বন্ধে কোন কিছু আঁচ করতে পেরেছে কিনা কে জানে। এ অবস্থায় সাবধানতা হিসাবে সর্বাগ্রে ওঁর পোষাক পরিচ্ছদগুলো পালটে ফেলা দরকার।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, তারপর এল রাত্রি।

সতর্ক ভাবে সব দিক ভাল করে দেখে শুনে নিয়ে এবার যুবকটি নিজে গিয়ে প্রফুল্লকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এলেন একান্ত আপন জনের মত। বিদায় বন্ধু, বিদায়। কামনা করি, তোমার যাত্রাপথ শুভ হোক।

কে এই দেশপ্রেমিক যুবক! নাম তার ত্রিগুনাচরণ ঘোষ।

প্লাটফর্মে নানা জাতীয় যাত্রীর ভীড়। সবাই অপেক্ষা করছে কলকাতার গাড়ীর জন্য। কখন গাড়ী আসবে কে জানে।

সবার আড়ালে প্লাটফর্মের এক কোণে চুপচাপ বসে প্রফুল্ল। মাথায় রাশি রাশি চিন্তার বোঝা। কত কথা ভীড় করে আসে মনে। একটার পর আর একটা। অসংখ্য।

মনে পড়ে সঙ্গী ক্ষুদিরামের কথা। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েছে অদৃষ্টে তার জন্য কি অপেক্ষা করে আছে কে জানে!

মনে পড়ে সমস্তিপুরের সেই বন্ধুটির কথা। সব কিছু জেনেও না জানার ভান করে যে ভাবে তিনি তাকে সবরকম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আগলে রেখেছিলেন, সংসারে তার তুলনা কোথায়।

প্রফুল্লর সেদিনের সেই যাত্রা কিন্তু মোটেই শুভ হয়নি কল্যাণী। সহসা এক ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর বেশে এগিয়ে এল গুটি গুটি পায়ে। নাম তার নন্দলাল। সিংভূমের কুখ্যাত পুলিস সাব ইন্‌সপেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জী।

অযাচিত ভাবে প্রফুল্লর সঙ্গে তার কত কথা। কত গল্প। কলকাতায় যাচ্ছেন বুঝি! যাক্, ভালই হল। আমিও যাচ্ছি কলকাতায়। বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে দুজনে।

প্রফুল্ল বিব্রত। দ্বিধা ও কুণ্ঠায় জড়সড়। কে এই লোকটা! কেন লোকটা এমন অযাচিতভাবে আলাপ জমাতে চায়! কি মতলব ওর!

—আমিও কলকাতার লোক, তবে চাকরী করি অন্যত্র। এখন অবশ্য ছুটিতে আছি। তাই ভাবলাম যে যাই, একবার মজঃফরপুর থেকে ঘুরে আসি। আত্মীয়স্বজনরা ওখানেই সব রয়েছেন কিনা। তা গতরাত্রে সে যা কাণ্ড। কে বা কারা ওখানকার ব্যারিষ্টার কেনেডি সাহেবের গাড়ীতে বোমা ছুঁড়েছে, ফলে মিসেস্ এবং মিস্ কেনেডি দুজনেই মারা গেছে!

কেনেডি! চমকে উঠলেন প্রফুল্ল। মারতে চেয়েছিল তারা কিংসফোর্ডকে, আর তার পরিবর্তে মারা গেল কিনা দুটি অসহায় নিরপরাধ নারী। এ দুঃখ সে রাখবে কোথায়!

নন্দলালের চোখে মুখে সন্দেহের কুটিল রেখা। যুবকটি হঠাৎ এভাবে চমকে উঠল কেন। কি ব্যাপার! কে এই অপরিচিত যুবক।

আততায়ীদের একজন ওয়াইনীতে ধরা পড়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। অন্যজন এখনো পলাতক। তবে কি ইনিই সেই! নিশ্চয়ই তাই।

দেখতে দেখতে লোভী মনটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল নন্দলালের। এ সুযোগ ছাড়লে চলবেনা। ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে নিশ্চয়ই মোটা টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। চাই কি সঙ্গে একটা খেতাব জুটে যাওয়াও বিচিত্র নয়। চাকুরী জীবনে এ যে আশাতীত সৌভাগ্য। সুতরাং যে করে হোক, গ্রেপ্তার ওকে করতেই হবে।

গ্রেপ্তার ঠিকই করা হয়েছিল কল্যাণী, তবে প্রফুল্লকে নয়, তার মৃতদেহটাকে।

বিশ্বাসঘাতক নন্দলালকে লক্ষ্য করে সে কি ঘৃণাব্যঞ্জক উক্তি তখন প্রফুল্লর। 'ছিঃ! এই আপনার বন্ধুত্ব! বাঙ্গালী হয়ে একজন বাঙ্গালীকে আপনি এভাবে ধরিয়ে দিলেন! তাহলে চেয়ে দেখুন যে, সত্যিকার বাঙ্গালী কত সহজে মরতে পারে!'

কথাটা বলেই ত্রস্তে পকেট থেকে পিস্তল তুলে নিয়ে নিজের কপালে লক্ষ্য স্থির করলেন প্রফুল্ল। বুঝি এক লহমার ব্যাপার, তার পরই তাঁর প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল শক্ত মাটির বুকে। নিজের প্রাণ দিয়ে তিনি প্রমাণ করে গেলেন যে বাঙ্গালী সত্যই মরতে কোনদিনও ভয় পায়না।

মৃত্যুর পরে প্রফুল্লর গুলীবিদ্ধ দেহটাকে মজঃফরপুর পাঠিয়ে দেওয়া হল ক্ষুদিরামের সনাক্তকরণের জন্য। তারপর দেহ থেকে মুণ্ডটা কেটে নিয়ে পাঠানো হল সোজা কলকাতায়।

এ সম্বন্ধে তখনকার সময়ের সংবাদপত্রে কি বলা হয়েছিল শোন।

Arrest of Dinesh Ch. Roy

"The arrest and suicide of D. C. Roy were most sensational. He got as far as Samastipur station on the B & N.W.

a'lway on friday, and took an inter class ticket from there to Mocama ghat where he alighted.

There he took another inter class ticket for Howrah. A plain clothes constable of Muzaffarpur Police shadowed him from Samastipur and his behaviour being suspicious arrested him but the deceased wrenched himself off and ran down the platform with the police after him.

Finding retreat of no avail he turned round and fired at the constable nearest to him. The bullet missed and constable closed but deceased having some freedom used the pistol on himself, one shot entered under his chin and one over the left collar bone. He dropped dead bleeding profusely. The weapon was a Browning pistal.

[Amrita Bazar patrika : 7th May : 1908]

অমৃতবাজার পত্রিকার এই বিবরণে তথ্যের দিক থেকে কিছুটা ভুল রয়েছে কল্যাণী। সেদিন মজঃফরপুর থেকে কোন কনেষ্টবল প্রফুল্লকে অনুসরণ করেনি। আসলে প্রফুল্লর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সিংভূমের পুলিস সাব ইনস্‌পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জীর। তাও ঘটনাচক্রে। যাক্, এবার প্রফুল্লর ছিন্নমস্তক সম্বন্ধে অমৃত বাজারের কি বক্তব্য শোন।

The Suicide's Head

"The head of late D. C. Roy who shot himself at Mocama on being arrested has been brought to Calcutta for purposes of identification. It is preserved in spirits of wine."

এবার শোন তখনকার সময়ের বাংলা পত্রিকার বিবরণ।

দীনেশচন্দ্র রায়, ওরফে প্রফুল্লচন্দ্র চাকীর আত্মহত্যার বিবরণ

"ক্ষুদিরাম যে যুবকের মৃতদেহ দেখিয়া পুলিসের নিকট তাহাকে

দীনেশচন্দ্র রায় নামে পরিচিত করিয়াছিল, তাহার প্রকৃত নাম প্রফুল্লচন্দ্র চাকী।

মজঃফরপুর হইতে প্রফুল্ল হাঁটিয়া সমস্তিপুর আসিয়া পৌঁছে ও সেখান হইতে একখানা নতুন কাপড় ও একজোড়া নতুন জুতা কিনিয়া বেশ পরিবর্তন করে। সমস্তিপুর হইতে হাওড়ার টিকেট লইয়া রাত্রির গাড়ীতে মোকামা ঘাটের দিকে রওনা হয়।

সমস্তিপুরে প্রফুল্লের নতুন কাপড়, জুতা, ফুলো পা দেখিয়া একজন পুলিস সাব ইনস্‌পেক্টরের মনে সন্দেহ জন্মিল। ইহার নাম নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মজঃফরপুরের গভর্ণমেণ্ট উকিলের নাতি।

নন্দলাল রাঁচিতে কার্য্যস্থলে যাইতেছিলেন। প্রফুল্লের প্রতি সন্দেহ হওয়াতে নন্দলাল গাড়ীতে তাহার সঙ্গে এক কামরায় উঠিয়া বসিল এবং পুলিসের ঠিক চতুরতার সহিত খুব ঘনিষ্টভাবে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা ও রাজনৈতিক সংবাদ প্রভৃতি সম্বন্ধে এরূপ মত সকল প্রকাশ করিতে লাগিল, যাহাতে প্রফুল্ল নন্দলালকে তাহারই মতাবলম্বী বলিয়া বিশ্বাস করিল।

ইতিমধ্যে নন্দলাল মজঃফরপুরে গভর্ণমেণ্ট উকিলকে তারযোগে জিজ্ঞাসা করিল যে, সন্দেহের উপরে প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করা যাইতে পারে কি না। ম্যাজিষ্ট্রেটের মত লইয়া মজঃফরপুর হইতে গ্রেপ্তারের হুকুম দেওয়া হইল। নন্দলাল তখন স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইল।

ফেরি ষ্টীমারে নন্দলাল ও প্রফুল্ল ঘাটে পৌঁছিল। প্রফুল্ল তরুন বয়স্ক বালক। সে তখনও নন্দলালকে কিছুমাত্র চিনিতে পারে নাই। নন্দলাল স্বদেশের জন্য তাহারই মত বেদনা বোধ করে তাহারই মতাবলম্বী দেখিয়া প্রফুল্ল তাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

ষ্টীমার হইতে ট্রেনে উঠিবার সময় প্রফুল্ল নন্দলালের জিনিষপত্র নিজের কাঁধে করিয়া বহিয়া লইল—নন্দলালকে কুলী নিযুক্ত করিতে দিল না। এদিকে নন্দলাল বরাবর ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে যাইয়া তাহাকে সকল কথা জানাইল, এবং প্রফুল্ল প্লাটফর্মে আসিবা মাত্র একজন কনেষ্টবলকে হুকুম দিল—'গ্রেপ্তার কর'।

প্রফুল্ল স্তম্ভিত হইল। তাহার তখনকার মনের অবস্থা বর্ণনা করা অনাবশ্যক। সে চীৎকার করিয়া বলিল—'তুমি বাঙ্গালী হইয়া আমাকে গ্রেপ্তার করিতেছ?'

কনেষ্টবল পশ্চাৎদিক হইতে প্রফুল্লকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। প্রফুল্ল সবলে কনেষ্টবলকে ভূপাতিত করিল। পর মুহূর্তেই পিস্তল বাহির করিয়া প্লাটফর্মের অপর দিকে কয়েক পা হাঁটিয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ অপর এক দিক হইতে আর একজন কনেষ্টবল আসিয়া পড়িল। প্রফুল্ল এই কনেষ্টবলের দিকে গুলি চালাইল। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল।

এদিকে পতিত কনেষ্টবল আবার অগ্রসর হইল। প্রফুল্ল দেখিল আর পালাইবার উপায় নাই। তখন দৃঢ়পদে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পিস্তল নিজের দিকে বাঁকাইয়া ধরিল। পিস্তলের দুইবার আওয়াজ হইল—প্রথম গুলি বক্ষ ও দ্বিতীয় গুলি চিবুকের নিম্নদেশ বিদ্ধ করিল। তৎক্ষণাৎ সেই স্থলেই প্রফুল্লের মৃতদেহ ভূপাতিত হইল।

প্রফুল্লের মৃতদেহ সনাক্ত করিবার জন্য মজঃফরপুরে আনা হইল। বন্ধুর মৃতদেহ দেখিয়া ক্ষুদিরাম শোকাচ্ছন্ন হইল। সে বলিল—ইহা তাহার বন্ধু দীনেশচন্দ্র রায়ের মৃতদেহ।

প্রফুল্লের ছিন্ন মস্তক

ইহার পর পুলিসের কর্তাদের হুকুমে প্রফুল্লের মৃতদেহ হইতে গলা কাটিয়া ফেলা হইল এবং একটা কেরোসিনের টিনে স্পিরিটে ডুবাইয়া প্রফুল্লের ছিন্নমস্তক কলিকাতায় আনা হইল। ভাল করিয়া

সনাক্ত করিবার উদ্দেশ্যে নাকি এরূপ করা হইয়াছে।" [সঞ্জীবনী সাময়িক পত্র : ১৪ই মে : ১৯০৮]

প্রফুল্ল চলে গেলেন। বাকী রইলেন ক্ষুদিরাম। এবার সেই ক্ষুদিরামের কথা শোন।

১লা মে ক্ষুদিরাম ধরা পড়লেন ওয়াইনী ষ্টেশনে। ধরা পড়লেন কনেষ্টবল শিবপ্রসাদ মিশ্র ও ফতে সিং এর হাতে জল খেতে গিয়ে।

'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে।'

আসামী ধরা পড়েছে। মিসেস্ ও মিস্ কেনেডির উপর বোমা নিক্ষেপকারী আসামী রিভলবারসহ ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে ওয়াইনী রেল ষ্টেশনে।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মজঃফরপুরের পুলিস সুপার মিঃ আর্মষ্ট্রং ওয়াইনীতে ছুটে এলেন সশস্ত্র এক পুলিস বাহিনী নিয়ে। কোথায় আসামী। ডাকো তাকে।

ক্ষুদিরামের সারা মুখে সলজ্জ স্মিত হাসি। যেন এ একটা খেলা মাত্র।

আর্মষ্ট্রং অবাক। এই আসামী। আশ্চর্য্য। ছেলে তো নয়, ঠিক যেন স্বর্গের কোন দেবদূত। সারা মুখে কি শিশুর মত সারল্য ওর। দেখে বিশ্বাস করাও যেন শক্ত।

সেদিনই বিকেল পাঁচটায় আর্মষ্ট্রং মজঃফরপুর ফিরে গেলেন বন্দী ক্ষুদিরামকে সঙ্গে নিয়ে।

ততক্ষণে গোটা শহরটাই বুঝি ভেঙে পড়েছে মজঃফরপুর রেল ষ্টেশনে। পুলিস সুপার আর্মষ্ট্রং বন্দীবীরকে নিয়ে স্পেশাল ট্রেনে করে ফিরে এসেছেন,—এ খবর তাদের তখন জানতে বাকী নেই। তাই এই ফাঁকে তারা চায় বাংলার এই বন্দীবীরকে একবার দেখতে। তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে।

পুলিস তাদের সে সুযোগ দিতে রাজী নয়। না, কাউকে সামনে আসতে দেওয়া হবে না। দূর হ:টা। তফাৎ যাও সব।

যথাসময়ে পুলিস পরিবেষ্টিত অবস্থায় প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে আস্তে আস্তে মাটিতে পা দিলেন ক্ষুদিরাম। সারা মুখে তাঁর তেমনি মিষ্টি মধুর হাসি। যেন এটা একটা হাসির ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়।

হাসতে হাসতেই একবার তিনি তাকালেন অদূরে দণ্ডায়মান উৎসুক জনতার দিকে। তারপরই পা বাড়ালেন বাইরে নির্দ্দিষ্ট ফিটন গাড়ীটা লক্ষ্য করে। মুখে তাঁর একটিই মাত্র মন্ত্র বন্দেমাতরম! বন্দেমাতরম! বন্দেমাতরম।

সরকারী মুখপত্র ষ্টেট্‌সম্যানের ভাষায়:

"The Railway station was crowded to see the boy. A mere boy of 18 or 19 years old, who looked quite determined.

He came out of a first class compartment and walked all the way to phaeton, kept for him outside, like a cheerful boy who knows no anxiety···on taking his seat the boy lustily cried Bandemataram."

[The Statesman : 2-5.1908]

ষ্টেশন থেকে সোজা ইয়োরোপীয়ান ক্লাব। তারপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ. সি. উডম্যান কর্তৃক জবানবন্দী গ্রহণ।

তখনকার সময়ের সাময়িকপত্র থেকেই তার বিস্তৃত বিবরণ শোন।

"শুক্রবার বেলা ১টার সময় ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী ওয়াইনী ষ্টেশন হইতে খবর আসিল ক্ষুদিরাম ধরা পড়িয়াছে। পুলিস সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট তৎক্ষনাৎ ওয়াইনী গমন করিলেন। সন্ধ্যার সময় ক্ষুদিরামকে লইয়া তিনি মজঃফরপুর ফিরিয়া আসিলেন। তাহাদের জন্ত ষ্টেশনের বাহিরে একখানা ফিটন গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল।

ক্ষুদিরাম দৃঢ় পদে সহাস্ত বদনে গাড়ীতে আরোহন করিল।

তাহার একদিকে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও অপর দিকে আর একজন পুলিস কর্মচারী উপবেশন করিলেন। ক্ষুদিরাম উচ্চৈঃস্বরে বন্দে মাতরম বলিতে লাগিল—গাড়ী তাড়াতাড়ি ষ্টেশন হইতে চলিয়া গেল।

ক্ষুদিরামের উক্তি :

গাড়ী ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে পঁহুছিবা মাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট ক্ষুদিরামের উক্তি শুনিবার জন্য আগমন করিলেন।

ক্ষুদিরাম বলিল,—আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু—বাড়ী মেদিনীপুর। এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। আমি কিংসফোর্ডকে বধ করিবার জন্য আসিয়াছিলাম। তাঁহার ন্যায় উৎপীড়ক আর ভারতবর্ষে কেহ নাই। তাঁহাকে বধ না করিয়া দুইজন নিরপরাধিনী স্ত্রীলোককে যে আমি হত্যা করিয়াছি, এজন্য আমার মর্মান্তিক যাতনা হইয়াছে।

আমি মেদিনীপুর হইতে এখানে আসিয়াছি। হাওড়ায় আমার সহচর দীনেশের সঙ্গে দেখা হয়। দীনেশের সঙ্গে একটা বোমা ছিল। দীনেশ বোমা তৈয়ার করিতে পারিত।

আমার সঙ্গে ২টা রিভলবার ও কতগুলি গুলি ছিল। উহা আমি কলিকাতায় কিনিয়াছিলাম। আমরা ৭।৮ দিন পূর্বে মজঃফরপুর পঁহুছিয়া ধর্মশালায় অবস্থিতি করিয়াছিলাম। ধর্মশালার নিকটে কিশোরীবাবুর অফিস ছিল। আমাদের কেহ যখন জিজ্ঞাসা করিত যে, আমরা কোথায় থাকি আমরা বলিতাম, কিশোরীবাবুর বাসায় থাকি।

আমরা সর্বদা কিংসফোর্ডের খবর লইতাম। আমরা দেখিলাম, মিঃ কিংসফোর্ড কুঠি হইতে কয়েকগজ দূরবর্তী ক্লাব ব্যতীত আর কোথাও যান না। একদিন কাছারীতে গিয়া দেখিলাম, তিনি সেসনের বিচার করিতেছেন। একবার মনে হইল, তখনই বোমা

নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে সংহার করি, কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে হইল অনেক নির্দোষের মৃত্যু হইবে, তখন ক্ষান্ত হইলাম।

৩০শে এপ্রিল মিঃ কিংসফোর্ডের গাড়ী কখন ক্লাব হইতে ফিরিয়া আসিবে, তাহার প্রতীক্ষায় ছিলাম। একখানা গাড়ী আসিতেছে দেখিয়া আমি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।

আমাদের উভয়ের পা খালি ছিল। বোমা নিক্ষেপের পর দীনেশ বাঁকীপুরের দিকে পলাইল, আর আমি সমস্তিপুরের দিকে দৌড়িয়া গেলাম। ওয়াইনী ষ্টেশনে এক মুদির দোকানে যখন আমি জল খাইতেছিলাম, তখন দুইজন কনেষ্টবল আসিয়া আমাকে গ্রেপ্তার করে।

কলিকাতায় এক গুপ্ত সমিতি আছে, সেই সমিতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি মিঃ কিংসফোর্ডকে বধ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি সংবাদপত্র পাঠ করিয়া ও বক্তৃতা শুনিয়া খুব উত্তেজিত হইয়াছিলাম।

যদি ধরা পড়ি, তবে তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিবার অভিপ্রায়ে পিস্তল সঙ্গে রাখিয়াছিলাম।" (সঞ্জীবনী : ৭ই মে : ১৯০৮ সন)

৩রা মে প্রফুল্ল চাকীর মৃতদেহ নিয়ে আসা হল মজঃফরপুরে। সঙ্গে সঙ্গে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে আবার ডাক পড়ল ক্ষুদিরামের। বলো, এই মৃতদেহ কার?

—দীনেশ রায়ের।

—এই জামাটা কার? একটা রক্তাক্ত নতুন জামা দেখানো হল ক্ষুদিরামকে।

—চিনতে পারছিনে।

—এগুলো চিনতে পার? একটা ময়লা গেঞ্জি ও একজোড়া পাম্পসু তুলে ধরা হল ক্ষুদিরামের সামনে।

—না, এর আগে কোনদিনও দেখিনি।

—এটা দেখেছিলে কি? এবারে দেখানো হল একটি ব্রাউনিং পিস্তল।

—না দেখিনি, তবে দীনেশ বলেছিল, তার কাছে একটা পিস্তল আছে।

—এই চাদর দুটো কার বলতে পার?

—দীনেশের। একখানা ছিঁড়ে দুখানা করা হয়েছে। আমি যখন দেখেছিলাম, তখন ছেঁড়া ছিল না।

—এই ধুতিটা কার?

—বলতে পারবোনা।

—দীনেশ কোথায় থাকতো বা কোথায় পড়াশুনো করতো, বলতে পার কি?

—ভাইয়ের কাছে বাঁকীপুরে থাকতো। দীনেশ নিজেই আমাকে একথা বলেছিল। কোথায় পড়াশুনো করতো তা আমার জানা নেই।

—তার ভাইয়ের নাম কি?

—আমার জানা নেই।

কথাটা কিন্তু মোটেই ঠিক নয় কল্যাণী। প্রফুল্ল বাঁকীপুরের ছেলে নয়, রংপুরের। থাকতেন মুরারী পুকুরের সেই ঐতিহাসিক বাগান বাড়ীতে। ক্ষুদিরাম তা জানতেন না। ইচ্ছা করেই তাকে সে কথা জানানো হয়নি। কারণ—সেই 'মন্ত্রগুপ্তি'।

এবার শুরু হল মামলা।

দায়রা আদালতে বিচারযোগ্য মামলা বলে ২১শে মে তারিখে প্রাথমিক বিচারের জন্য ক্ষুদিরামকে হাজির করা হল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ই. বি. বার্থাউডের আদালতে।

২৩শে মে তারিখে সেখানে নতুন করে আবার একটি বিবৃতি দিলেন ক্ষুদিরাম।

বিবৃতি দুটি তুমি ভাল করে লক্ষ্য কর কল্যাণী। দেখবে—দুটোর সুর সম্পূর্ণ আলাদা।

কিন্তু কেন! কি এর কারণ!

কারণ, সঙ্গী প্রফুল্ল চাকী। প্রথম বিবৃতিতে একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর টেনে নিয়ে সঙ্গী প্রফুল্ল চাকীকে সব রকম বিপদ থেকে আড়াল করে রাখা।

স্বাভাবিক কারণেই দ্বিতীয় বিবৃতিতে সে চেষ্টা আর তিনি করেন নি। কারণ সঙ্গী প্রফুল্ল তখন সব কিছু বিচারের ঊর্ধে। যাক, প্রথম বিবৃতিটি আগেই শুনেছ। এবার দ্বিতীয়টিও শোন।

আমার নাম ক্ষুদিরাম বসু। পিতা স্বর্গীয় ত্রৈলোক্য নাথ বসু। জাতিতে কায়স্থ। পেশায় ছাত্র। বাড়ী মেদিনীপুর জেলার—মোঝায়।

—তুমি কি ১লা মে আরিখে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট উডম্যানের কাছে কোন জবানবন্দী দিয়েছিলে? প্রশ্ন করলেম বিচারপতি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বারটড্।

—হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।

—দীনেশের পুরো নাম কি?

—দীনেশ চন্দ্র রায়।

—এগুলো কার জানো? (দু জোড়া জুতো দেখানো হল)

—হ্যাঁ জানি। এক জোড়া আমার অন্য জোড়া দীনেশের।

—কখন, কোথায় তোমরা জুতো ফেলে গিয়েছিলে?

—বোমা নিক্ষেপ করার দশ পনেরো মিনিট আগে একটা গাছ তলায় রেখে দিয়েছিলাম।

—এই ব্যাগটা চিনতে পার?

—পারি।

—এটা কোথায় ফেলে গিয়েছিলে?

—ধর্মশালার পশ্চিম মুখো একটা ঘরের মধ্যে।

—তখন কি ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে এসেছিলে?

—হ্যাঁ তাই।

—ব্যাগটা এনেছিলে কেন?

—বোমা বয়ে আনার জন্য।

—ব্যাগের মধ্যে তুলো ছিল কেন?

—তুলো দিয়ে বোমা জড়ানো ছিল।

—এই টিনের কৌটোটা কোথায় রেখেছিলে?

—মাঠের মধ্যে।

—এটা এনেছিলে কেন?

—এর ভেতরেই বোমা ছিল।

—এই কাপড়টা চিনতে পার?

—হ্যাঁ, এটা দিয়ে বোমা জড়ানো ছিল।

—এই রিভলবার দুটো চেন কি?

—হ্যাঁ, চিনি।

—আর এই পিস্তলটা?

—সেদিন জবানবন্দী দেবার সময় ওটা প্রথম দেখেছিলাম। শুনেছিলাম দীনেশের সঙ্গে একটা পিস্তল ছিল।

—কনেষ্টবল ফৈয়াজ খাঁ আর তহশীলদার খাঁর এজাহার শুনেছ কি? তারা বলেছে, ঘটনার আগে নাকি তোমাকে আর দীনেশকে তারা ক্লাবের বাইরে দেখেছিল। এটা কি সত্যি?

—হ্যাঁ, তারা আমাদের দেখেছিল।

—তারা যে এজাহার দিয়েছে তা কি ঠিক?

—সবটা ঠিক নয়।

—তাদের এজাহারের কোন কোন অংশ মিথ্যে?

—তারা বলেছে, বোমা ফাটার সময়ে তারা জজকোর্ট রোডে ছিল না। এটা মিথ্যে কথা। প্রকৃত পক্ষে তারা তখন কাছেই একটা সেতুর উপর বসেছিল।

—তোমার গ্রেপ্তার সম্বন্ধে কনেষ্টবল শিবপ্রসাদ মিশ্র ও ফতে সিং যে এজাহার দিয়েছে তা কি সত্য?

—সবটা সত্য নয়, কিছু কিছু মিথ্যে আছে।

—দীনেশের সঙ্গে কবে থেকে তোমার পরিচয়?

—এখানে আসার পাঁচ সাতদিন আগে যুগান্তর অফিসে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

—যুগান্তর অফিসে গিয়েছিলে কেন?

—আমি মেদিনীপুরে যুগান্তর বিক্রি করতাম। কিছুদিন যাবৎ কাগজ পাচ্ছিলাম না। তাই খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম।

—দীনেশের সঙ্গে তোমার কি কি কথা হয়?

—একদিন আমি যখন খেতে বসেছিলাম, তখন দীনেশ আমার কাছে আসে। সে আমার পরিচয় জানতে চায়। আমার নাম শুনে সে আমাকে চিনতে পারে, কারণ মেদিনীপুরে আমার বিরুদ্ধে কিছুদিন আগে পুলিস একটা মামলা করেছিল। কথাবার্তার পরে সে আমাকে জানায় যে, একটা কাজ করতে পারলে অনেক পুরস্কার পাওয়া যাবে। আমি রাজী হই। তখন সে আমাকে শুক্রবার তিনটের সময় হাওড়া ষ্টেশনে দেখা করতে বলে। সেখানে সে আমাকে কিংসফোর্ডকে হত্যার কথা বলেছিল।

—তুমি রাজী হয়েছিলে?

—হ্যাঁ, নানা ভাবে বোঝাবার পরে আমি তার প্রস্তাবে রাজী হয়েছিলাম।

—দীনেশ তোমাকে কি কি বলতে নিষেধ করেছিল?

—রিভলবার কোথায় পেয়েছি, তা কাউকে বলতে নিষেধ করেছিল। বলেছিল,—প্রয়োজন হলে আমি যেন অমূল্য দাসের নাম বলি।

—সে তোমাকে আর কিছু বলতে নিষেধ করেছিল?

—হ্যাঁ, বলেছিল,—আমি যেন তাঁর কথা কাউকেও কিছু না বলি। প্রয়োজন হলে একথাই যেন বলি যে, যুগান্তর এবং বড় বড় বিশিষ্ট নেতাদের বক্তৃতা শুনেই আমি এ পথে এসেছি।

৯ই জুন মঙ্গলবার মজঃফরপুরের এডিশনাল সেসন জজ মিঃ

কর্ণডফ্-এর আদালতে শুরু হল আসল বিচার। সঙ্গে রইলেন দুজন এসেসার। বাবু নাথুনি প্রসাদ আর জনক প্রসাদ।

সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করবার দায়িত্ব নিলেন বাঁকীপুরের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার মিঃ মান্নুক এবং সরকারী উকিল বিনোদবিহারী মজুমদার। ক্ষুদিরামের পক্ষে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন মজঃফরপুরের একজন দেশপ্রেমিক আইনজীবী—কালিদাস বসু। আর রংপুর থেকে এলেন সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এবং নৃপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

প্রধান সাক্ষী মজঃফরপুরের পুলিস সুপার মিঃ জে. ই. আর্মষ্ট্রং, সাব ইনস্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জী, কনেষ্টবল শিবপ্রসাদ মিশ্র ও ফতে সিং এবং মিঃ কিংসফোর্ড স্বয়ং। তাছাড়া কিংসফোর্ডের বাংলোর প্রহরী তহশীলদার খান ও ফৈজুদ্দিন খান, তার ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান কালীরাম, ধর্মশালার ভৃত্য খৈমন কাহার ইত্যাদি আরো কয়েকজন। সব মিলিয়ে চব্বিশ জন।

প্রথমেই শোন সেই স্বনামধন্য সাব ইন্‌স্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জীর কথা। ইতিপূর্বে ২২শে তারিখেই তিনি এক দীর্ঘ জবান-বন্দী দিয়েছিলেন মহামান্য আদালতের কাছে। এবারও সাক্ষী দিতে এসে বললেন সেই একই কথা।

"On the 30th April I was at Muzaffarpur on leave from Singbhum. On the 1st morning I heard of the occurrence committed by Bengalees.

I was returning to Singbhum by 6-30 P. M. train from Muzaffarpur on the 1st. At Samastipur at night I met the deceased on the platform. He had a new 'Panjabi' new dhoti, new pump shoes ; he was bare headed.

He asked me what time the train leaves and I got into conversation. He had a ticket to Mokama Ghat. We both got into the same compartment.

From his way of speaking and appearance I suspected. Before the train left Samastipur I sent wire to Shib chandra Chatterjee senior Government pleader my maternal grand father asking him to obtain permission of Police to arrest a man on suspicion.

I got reply at Mokama at 12-30 A. M. on the 2nd May. The man went with me to Mokama. He changed seat to another compartment as he was annyoed by my questions.

At Mokama I asked him to look after my things in the morning before I had apologised to him.

I then went straight to Station Master's office to bring two men to be witness to arrest as I made up my mind to arrest him.

I asked the S. M. to give two men. At once they came. As I came out I met S. I. Sarma. I got wire from Superintendent of Police Muzaffarpur. Having read the wire I told youth 'I suspect you' and as I wanted to arrest him he fled away. I cried out.

A Railway Police constable came from opposite direction. Then I heard report of a shot and saw a Bengali fired at a constable who seized him.

The constable who was with S. I. Sarma also seized him. Then I heard two reports and the suspect fell dead.

I left with the corpse for Muzaffarpur that night. S. D. O. Mr. Bart and Superintendent of Police Patna were escorting dead body. The corpse was photoed at Baruni where the identification was held." [Amrita Bazar Patrika : 23.5.1908]

[সিংভূম থেকে ছুটি নিয়ে গত ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত আমি মজঃফরপুরে ছিলাম। ১লা মে বাঙ্গালীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত এই ঘটনার কথা জানতে পারি।

ঐ দিনই সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় আমি মজঃফরপুর থেকে সিংভূমের দিকে রওনা দিই। রাত্রে সমস্তিপুর ষ্টেশনের প্লাটফর্মে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা হয়। তার পরনে নতুন ধুতি ও পায়ে নতুন পাম্পসু ছিল। মাথায় কিছু ছিল না।

সে আমাকে প্রশ্ন করে যে, মোকামা ঘাটের গাড়ী কখন ছাড়বে। আমি তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে থাকি। তার সঙ্গে মোকামা ঘাটের টিকিট ছিল। আমরা একই কামরায় উঠেছিলাম।

তার কথাবার্তা ও হাবভাব দেখে আমার সন্দেহ হয়। সমস্তিপুর থেকে গাড়ী ছাড়ার আগেই আমি আমার মাতামহ মজঃফরপুরের সিনিয়র গভর্ণমেণ্ট প্লীডার শিবচন্দ্র চ্যাটার্জীকে এক টেলিগ্রাম করে জানাই যে, তিনি যেন পুলিস সাহেবের সঙ্গে দেখা করে একজন সন্দেহজনক লোককে গ্রেপ্তার করার জন্য একটি অনুমতি পত্র পাঠিয়ে দেন।

পরদিন ২রা মে সকাল সাড়ে দশটায় মোকামা ঘাট ষ্টেশনে আমি সেই টেলিগ্রামের জবাব পাই। লোকটি মোকামা ঘাট পর্য্যন্ত আমার সঙ্গেই গিয়েছিল। আমার কথাবার্তায় বিরক্ত হয়ে পরে অন্য কামরায় চলে গিয়েছিল।

সকাল বেলা মোকামা ঘাটে আমি তাকে আমার জিনিষপত্রের দিকে লক্ষ্য রাখতে অনুরোধ করি। তার আগে আমি তার কাছে ক্ষমা চেয়েছিলাম।

গ্রেপ্তারের সময় দুজন সাক্ষীকে উপস্থিত রাখার জন্য আমি ষ্টেশন মাষ্টারের অফিসে যাই, কারণ তখন আমি দৃঢ় সঙ্কল্প যে, লোকটিকে আমি গ্রেপ্তার করবো।

দুজন লোক দেবার জন্য আমি ষ্টেশন মাষ্টারকে অনুরোধ করি।

সঙ্গে সঙ্গেই তারা এলেন। ফিরে আসার সময় সাব ইনস্পেক্টর শর্মার সঙ্গে আমার দেখা হয়।

মজঃফরপুর থেকে প্রাপ্ত পুলিস সুপারের তারের কথা শুনিয়ে আমি তখন সেই লোকটিকে বলি যে,—'তোমাকে আমি সন্দেহ করি।' একথা বলে গ্রেপ্তার করার উদ্যোগ করতেই লোকটি ছুটে দৌড় দিল। সঙ্গে সঙ্গেই আমি চীৎকার করে উঠি।

বিপরীত দিক থেকে একজন রেলওয়ে কনেষ্টবল এগিয়ে এল। ঠিক তখনই আমি একটি গুলীর আওয়াজ শুনতে পাই। কনেষ্টবলটিকে লক্ষ্য করেই সেই বাঙ্গালী গুলী চালিয়েছিল।

এবার সাব ইনস্পেক্টর শর্মার সংগী পুলিসটি এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। মুহূর্ত বাদেই আমি পরপর ছবার গুলীর শব্দ শুনতে পাই এবং লোকটির প্রাণহীন দেহ মাটিতে পড়ে যেতে দেখতে পাই।

সেই রাত্রেই মৃতদেহ নিয়ে আমি মজঃফরপুর ফিরে যাই। মহকুমা হাকিম মিঃ বার্ট এবং পাটনার পুলিস সাহেবও সঙ্গে গিয়েছিলেন। বারুণী ষ্টেশনে মৃতদেহের ছবি তোলা এবং সনাক্ত করণের কাজ সম্পন্ন করা হয়।]

পরদিন ১০ই মে সাক্ষী দিলেন স্বয়ং কিংসফোর্ড। সে সম্বন্ধে সাময়িক পত্রে কি লেখা রয়েছে শোন:

অস্ত্রধারী পুলিস প্রহরীদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া আদালতে মিঃ কিংসফোর্ড হাজির হইলেন। ক্ষুদিরাম এযাবৎ আদালতের কাজ কর্মে কোনরূপ উৎসুক প্রকাশ করে নাই। এক্ষণে মিঃ কিংসফোর্ডকে দেখিয়া উৎসুক নেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইতে লাগিল। মিঃ কিংস-ফোর্ডকে দেখিবার জন্য আদালতে অনেক লোক জড় হইল।

মিঃ কিংসফোর্ড বলিলেন,—রাজদ্রোহাপরাধে অভিযুক্ত পত্রিকা যুগান্তর আমার নিকট ৩ বার, বন্দেমাতরম ১ বার ও নবশক্তি ১ বার অভিযুক্ত হইয়াছিল। এই সকল মোকদ্দমার পূর্বে ও পরে দেশীয় সংবাদ পত্রগুলি আমার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিল।

ঐ মোকদ্দমার পর আমার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত সমালোচনা খুব বৃদ্ধি পায়। ক্ষুদিরামের উকিলবাবু কালিদাস বসুর জেরায় মিঃ কিংসফোর্ড বলিলেন :

"কলিকাতার ছাত্রগণ আমার প্রতি কি ভাব পোষণ করিত, তাহা আমি জানিনা। দুইবার আদালত হইতে বাহির হইবার সময় রাস্তাতে কতগুলি লোক আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

সেই সব লোকের ভিতর কতগুলি ছাত্র এবং কতগুলি অপর লোক তাহা আমি বলিতে পারিনা। আমি বাংলা দেশের অন্যান্য জেলাতেও ছিলাম, সেখানে কেহ আমাকে অসম্মান করিয়াছে বলিতে পারিনা।" [সঞ্জীবনী : ১৮ই জুন : ১৯০৮ সন]

ঐদিনই রংপুর থেকে আগত উকিল সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী এক আবেদন পেশ করলেন বিচারপতি কর্ণডফের কাছে। আমি বন্দী ক্ষুদিরামের সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। আমাকে অনুমতি দেওয়া হোক।

অনুমতি দিলেন বিচারপতি কর্ণডফ, তবে একটি সর্তে। পুলিস কর্মচারীদের সামনে কথা বলতে হবে। আড়ালে নয়।

ক্ষুদিরামের সঙ্গে সতীশবাবুর সেদিন যে কথাবার্তা হয়েছিল, তার বিস্তৃত বিবরণ তখনকার দিনের সাময়িক পত্র থেকেই তুলে দিচ্ছি।

"রংপুরের উকীল বাবু সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ক্ষুদিরামের সঙ্গে কিঞ্চিৎ কথাবার্তা বলিবার অভিপ্রায়ে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। জজ অনুমতি দিলেন।

ক্ষুদিরাম কাঠগড়ার ভিতরে ছিল। অস্ত্রধারী পুলিস ও উকীলগণ কাঠগড়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্ষুদিরামের মুখে অন্তর্নিহিত তেজোগর্ব পরিস্ফুট, তাঁহার কথাবার্তায় কোনরূপ কুণ্ঠা বা উদ্বেগের লেশ মাত্র নাই।

সতীশবাবুর প্রশ্নের উত্তরে ক্ষুদিরাম অবিচলিত ভাবে বলিতে লাগিল :

মেদিনীপুর শহরে আমার বাড়ী। আমার বাপ, মা, ভাই কাকা বা মামা কেহ নাই। কেবল আমার এক বোন আছেন। তাঁর অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে ; বড়টির বয়েস আমার মতই হইবে।

বাবু অমৃত লাল রায়ের সহিত দিদির বিবাহ হইয়াছে। তিনি মেদিনীপুরে জজের হেড ক্লার্ক। ইহারাই আমার একমাত্র স্বজন !

বাবু অবিনাশচন্দ্র বসু নামে আমার এক পিসতুত ভাই আছেন। তিনি আমার তত্ত্ববার্তা লননা।

আমি এণ্ট্রাস স্কুলের ২য় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। ২।৩ বৎসর হইল পড়া ছাড়িয়াছি। পড়া ছাড়িয়াই স্বদেশী আন্দোলনে কাজ করিতে আরম্ভ করি। সেই সময় হইতে আমার ভগিনীপতি অমৃত-বাবু আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আমার মা নাই। বাবা ১০।১১ বছর হইল মারা গিয়াছেন। আমার বিমাতা জীবিত আছেন। তিনি তাঁর ভাই সুরেন্দ্র নাথ ভঞ্জের নিকট থাকেন। সুরেন্দ্র নাথ ভঞ্জ কি করেন কোথায় থাকেন, তাহা আমি জানিনা।

—তুমি কাউকেও দেখিতে চাও কি ?

—হাঁ, একবার মেদিনীপুর দেখিতে চাই, আমার দিদি ও তাঁর ছেলে মেয়ে কয়টিকে দেখিতে চাই।

—তোমার মনে কোন দুঃখ আছে কি ?

—না, কিছু না।

—তোমার কোন আত্মীয়ের নিকট কোন খবর দিতে বা তাদের কাহাকেও তোমার পক্ষের সাহায্যের জন্য এখানে আসিতে বলিতে চাও ?

—না, তাঁদের কাছে কোন খবর পাঠাইতে আমার ইচ্ছা নাই। যদি তাঁরা ইচ্ছা করেন আসিতে পারেন।

—জেলে তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হয় ?

—একরূপ ভালই। জেলের খাবারটা খারাপ, আমার সহ্য হয় না, তাতেই আমার শরীর খারাপ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর কোন খারাপ ব্যবহার করে না। একটা নির্জন ঘরে আমাকে দিন রাত বন্ধ করিয়া রাখে ; কেবল একবার স্নানের সময় আমাকে বাহিরে আসিতে দেয়। একা থাকিতে থাকিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমাকে কোন খবরের কাগজ বা বই পড়িতে দেয়না—পাইলে বড় ভাল হয়।

—তোমার মনে কোনরূপ ভয় হয় কি ?

ভয়ের কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম হাসিয়া ফেলিল। হাসিয়া উত্তর করিল—কেন ভয় করিব ?

—তুমি গীতা পড়িয়াছ ?

—হাঁ, পড়িয়াছি।

—তুমি কি জান যে, তোমাকে বাঁচাইবার জন্য রংপুর হইতে আমরা কয়েকজন উকীল আসিয়াছি ? তুমিত পূর্বেই তোমাকে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিয়াছ।

নির্ভীক ক্ষুদিরাম মস্তক উন্নত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কেন স্বীকার করিব না ?

সকলে স্তম্ভিত হইলেন। সতীশবাবু বলিলেন—ক্ষুদিরাম, ভগবানকে স্মরণ কর। [সঞ্জীবণী : ১৮ই জুন : ১৯০৮]

সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরা শেষ। এবার দুপক্ষের সওয়াল জবাব।

প্রথমেই উঠে দাঁড়ালেন সরকার পক্ষের আইনজীবী ব্যারিষ্টার মিঃ মান্নুক। আসামী গুরুতর অপরাধে অপরাধী। নিজেই সে তার অপরাধের কথা স্বীকার করেছে। সুতরাং তার চরম শাস্তি পাওয়া উচিত।

১৩ই তারিখে তার জবাব দিলেন ক্ষুদিরামের পক্ষের উকীল শ্রীযুক্ত কালিদাস বসু। না, সরকার পক্ষের আইনজীবীর সঙ্গে আমি

একমত নই। আসামী অপরাধ স্বীকার করেছে, একথা সত্য, কিন্তু কেন স্বীকার করেছে সেটাও আমাদের বিচার করে দেখতে হবে।

আসামী ক্ষুদিরাম নিজেই বলেছে যে, তার একহাতে ছিল দীনেশের সিল্কের কোট। দীনেশই এটা তাকে রাখতে দিয়েছিল। অন্য হাতে ছিল দুটো বড় পিস্তল। এ অবস্থায় তার পক্ষে পিস্তল ছোঁড়া বরং সম্ভব, কিন্তু বোমা নিক্ষেপ কিছুতেই নয়। এর দ্বারাই বোঝা যায় যে আসলে বোমা নিক্ষেপ করেছিল দীনেশ, ক্ষুদিরাম নয়।

কে তাকে এ কাজ করতে উত্তেজিত করেছিল, কোথা থেকে সে পিস্তল ও তার গুলী পেয়েছিল, দীনেশের পরিচয় কি, এ সম্বন্ধে আসামী ক্ষুদিরামের উক্তি পরস্পর বিরোধী। দুজন বিচারকের কাছে সে দু রকম উক্তি করেছে। এর কারণ কি।

কারণ দীনেশ। দীনেশকে বাঁচাবার জন্যই সে স্বেচ্ছায় সব দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিয়েছিল।

ঘটনার রাত্রে স্বয়ং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করে জানতে পেরেছিলেন যে, সাদা সার্ট পরিহিত কেবল একজন মাত্র লোক বোমা নিক্ষেপ করেছিল। গ্রেপ্তার করার সময়ে আসামীর গায়ে কোন সাদা সার্ট দেখা গিয়েছিল কি? পাওয়া গিয়েছিল কি কোন বোমা তার কাছে?

আসামী নিজেই বলেছে যে, ঘটনার আগে এবং পরে তার গায়ে একটা কাল রংএর ছিটের কোট ছিল। তাহলে সেই সাদা সার্ট কোথায় গেল?

সুতরাং এটা সহজেই বোঝা যায় যে, আসলে বোমা নিক্ষেপ করেছিল দীনেশ, ক্ষুদিরাম তার সঙ্গে ছিল মাত্র। সে হিসেবে তার অল্প বয়েসের কথা চিন্তা করে বড় জোড় তাকে কিছুটা লঘু দণ্ড দেওয়া যেতে পারে, গুরু দণ্ড কিছুতেই নয়।

দেওয়া হল কিন্তু তাই কল্যাণী। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে বিচারক তার রায় দিলেন—মৃত্যুদণ্ড।

আশ্চর্য্য, ক্ষুদিরামের মুখে হাসি। সেই সলজ্জ হাসি, যা তার মুখে দেখা গিয়েছিল বরাবর।

দেখে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন দর্শকের আসনে উপবিষ্ট একজন শ্বেতাঙ্গ সাহেব। অসম্ভব! অবিশ্বাস্য! অকল্পনীয়! নিজের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা শুনে এমন করে হাসতে পারে কেউ কখনো! দেখালে বটে এই বাঙ্গালী যুবক!

'Are you a Bengali youth?' পাশে উপবিষ্ট একজন বাঙ্গালী যুবককে লক্ষ্য করে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন সেই শ্বেতাঙ্গ সাহেবটি।

'Yes.'

'Try to follow in the foot steps of your brother.'

কথাটা বলেই হঠাৎ সেই শ্বেতাঙ্গ সাহেবটি আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন গট্‌গট্‌ করে। আর ফিরেও তাকালেন না।

একই প্রশ্ন তখন বিচারপতি কর্ণডফের মনে। আসামী তার দণ্ডাজ্ঞা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু বুঝতে পারেনি। পারলে এ সময়ে তার মুখে এমন অনাবিল হাসি দেখা যেতো না।

কিন্তু সত্যিই কি তাই! সত্যিই কি ক্ষুদিরাম কিছু বুঝতে পারেননি নিজের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা সম্বন্ধে!

ভুল কল্যাণী, একেবারেই ভুল। এ সম্বন্ধে সাময়িকপত্রে কি লেখা রয়েছে শোন।

"একেবারে নির্বিকার ভাবে ক্ষুদিরাম দণ্ডাজ্ঞা শুনিলেন। কি নিম্ন আদালতে কমিটিং ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট, কি উচ্চ আদালতে সেসন জজের নিকট, মামলা শুনানী কালে ক্ষুদিরাম অধিকাংশ সময়ই নির্লিপ্ত ভাবে কাটাইতেন।

কখনো কখনো তাহাকে আসামীর কাঠগড়ায় নিদ্রিত অবস্থায় দেখা যাইত। আদালতে কি হইতেছে, না হইতেছে, সে সম্বন্ধে ক্ষুদিরাম প্রায়ই উদাসীন থাকিতেন। প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধের

অভিযোগে বিচারাধীন আসামীর এই নির্লিপ্ত ভাব এবং ঔদাসীন্য আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

মৃত্যু-দণ্ডাজ্ঞার পর ক্ষুদিরামকে সম্পূর্ণ অবিচলিত দেখিয়া এবং তাহার নির্বিকার ভাব লক্ষ্য করিয়া বিদেশী রাজার স্বজাতীয়, বিচারকের মনে সম্ভবতঃ এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আসামীর প্রতি যে চরমদণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া ফাঁসির হুকুমের পর জজ ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন: 'তোমার প্রতি যে দণ্ডের আদেশ হইল তাহা বুঝিতে পারিয়াছ?'

ক্ষুদিরাম হাস্য মুখে মাথা নাড়িয়া জানাইল—'বুঝিয়াছি'।

[সঞ্জীবনী: ১৮ই জুন: ১৯০৮ সন]

অত্যন্ত মর্মাহত হলেন উকীল কালিদাসবাবু। সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে, বিনা পারিশ্রমিকে এতদিন তিনি মামলা চালিয়ে এসেছিলেন ক্ষুদিরামের জন্য। রংপুর থেকে আগত সতীশ চক্রবর্তী ও নৃপেন লাহিড়ীও তাই। দুর্ভাগ্য যে এতকরেও সেই ক্ষুদিরামকে রক্ষা করা গেলনা।

কিন্তু না, হতাশ হবার মত কোন কারণ নেই। আবার আশায় বুক বাঁধলেন কালিদাসবাবু। এখনো হাইকোর্ট রয়েছে। দেখা যাক, ওখানে আপীল করে কিছু হয় কিনা!

আইনজ্ঞ হিসেবে বিশেষ অনুমতি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে জেলখানায় গিয়ে ক্ষুদিরামের সঙ্গে দেখা করলেন কালিদাসবাবু। হাইকোর্টে আপীল করতে হবে। একটা সই দাও এখানে।

অসম্মতি জানালেন ক্ষুদিরাম। কি হবে ওসব করে। যা হবার সেতো হবেই। তা হলে কি লাভ শুধু শুধু আপনাদের এই পরিশ্রম করে!

—শোন ক্ষুদিরাম। এবার মোক্ষম জায়গায় ঘা দিলেন কালিদাসবাবু, আজ তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তুমি কি তার কথার

অবাধ্য হতে? নাও আর আপত্তি করোনা। আমি যা-যা বলি, তুমি লিখে যাও।

ক্ষুদিরাম নিরুত্তর। কি বলবেন। বলার আছেই বা কি! এই পিতৃতুল্য মানুষটি যে সম্পূর্ণ অযাচিত ভাবে এগিয়ে এসে তার জন্য কি করেছেন, সে কথা তার চাইতে বেশী আর কে জানে! তাঁর এই একান্ত অনুরোধকে অস্বীকার করার মত সাধ্য তার কোথায়?

৮ই এবং ৯ই জুলাই কলকাতা হাইকোর্টে আপীলের শুনানী হল বিচারপতি মিঃ ব্রেট ও মিঃ রাইভস্ এর আদালতে।

এবার ক্ষুদিরামের পক্ষে দাঁড়ালেন নরেন্দ্র কুমার বসু। বিপক্ষে ডেপুটি লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার মিঃ ওর্।

রায় দেওয়া হল ১৩ই জুলাই। সেই একই রায়। অর্থাৎ—মৃত্যুদণ্ড।

তবু হাল ছাড়লেন না কালিদাসবাবু। এখনো বড়লাট বাহাদুর রয়েছেন। দেখা যাক তাঁর কাছে আবেদন করে কিছু হয় কিনা।

সবই বৃথা। আবেদন অগ্রাহ্য করলেন বড়লাট বাহাদুর। না, ক্ষুদিরামকে কোনরকম অনুগ্রহ প্রদর্শন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি।

অবশেষে ফাঁসির দিন ধার্য্য হল ১১ই আগষ্ট।

ততদিনে পল্লীকবির সেই অমর সঙ্গীত সুর তুলেছে দেশের এখানে ওখানে সর্বত্র। অলিতে গলিতে, পথে প্রান্তরে, ছোট বড়, বাউল ভিখারী সবার কণ্ঠে একই গান:

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।'

কনডেমড্ সেলের সেই নির্জন কক্ষে বসে ক্ষুদিরাম কি দূর থেকে ভেসে আসা স্বরে সেই অমর সঙ্গীত শুনতে পেয়েছিলেন কোনদিন! কে জানে!

আবেদন জানালেন বেঙ্গলী কাগজের সংবাদদাতা উপেন্দ্র নাথ

সেন, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট আইনজীবীগণ। হিন্দুমতে শবদেহ সৎকার করার জন্য ফাঁসির সময় আমরা উপস্থিত থাকতে চাই। আমাদের অনুমতি দেওয়া হোক।

অনুমতি পেলেন মাত্র দুজন। উপেন্দ্রনাথ সেন আর ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর শবদেহ বহন করার জন্য বাইরে উপস্থিত থাকতে পারবে বারোজন। শবানুগমন করার জন্য আরো বারোজন। ব্যস, এই শেষ। আর কারো শবানুগমন করা চলবেনা।

ব্যবস্থার কোনই ত্রুটি রাখলেননা কালিদাসবাবু, কিন্তু সব কিছুই আড়াল থেকে। ক্ষুদিরাম তার সন্তানতুল্য। এ দৃশ্য দেখা তার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়।

পরের কাহিনী প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনের 'ক্ষুদিরাম' নিবন্ধ থেকেই তুলে দিচ্ছি।

"১১ই আগষ্ট ফাঁসির দিন ধার্য্য হইল। আমরা দরখাস্ত দিলাম যে, ক্ষুদিরামের ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিব এবং তাহার মৃতদেহ হিন্দুমতে সৎকার করিব।

উড্‌ম্যান সাহেব আদেশ দিলেন, দুইজন মাত্র বাঙ্গালী ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিবে, আর শবদেহ বহন করিবার জন্য বারোজন ও শবের অনুগমনের জন্য বারোজন থাকিবে। ইহারা কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া যাইবে।

জেলে ফাঁসির সময় উপস্থিত থাকিবার জন্য আমি এবং ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল অনুমতি পাইলাম। আমি তখন 'বেঙ্গলী' কাগজের স্থানীয় সংবাদদাতা। বোমা পড়া হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় সংবাদ সে কাগজে পাঠাইতাম। কৌতূহলী পাঠক ঐ সময়ের 'বেঙ্গলী' কাগজের ফাইল পাইলে অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন।

আমি অতি গোপন ভাবে বাড়ীতে বসিয়া একটি বাঁশের খাটিয়া

প্রস্তুত করাইলাম। যেখানে মাথা থাকিবে, সেখানে ছুরি দিয়া কাটিয়া 'বন্দেমাতরম' লিখিয়া দিলাম।

ভোর ছয়টায় ফাঁসি হইবে। পাঁচটার সময় আমি গাড়ীর মাথায় খাটিয়াখানি ও আবশ্যকীয় সৎকারের বস্ত্রাদি লইয়া জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, নিকটবর্ত্তী রাস্তা লোকে লোকারণ্য। ফুল লইয়া বহু লোক দাঁড়াইয়া আছে।

সহজেই আমরা দুইজনে জেলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ঢুকিতেই একটি পুলিস কর্ম্মচারী প্রশ্ন করিলেন—'বেঙ্গলী কাগজের সংবাদদাতা কে ?'

আমি উত্তর দিলে হাসিয়া বলিলেন—'আচ্ছা, যান ভিতরে'।

দ্বিতীয় লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইলে আমরা জেলের আঙিনায় প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, ডানদিকে একটু দূরে প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে ফাঁসির মঞ্চ।

দুইদিকে দুইটি খুঁটি আর একটি মোটা লোহার রড্ বা আড় দ্বারা যুক্ত, তারই মধ্যস্থানে বাঁধা মোটা একগাছি দড়ি ঝুলিয়া আছে, তাহার শেষ প্রান্তে একটি ফাঁস।

একটু অগ্রসর হইতেই দেখিলাম, ক্ষুদিরামকে লইয়া আসিতেছে চারজন পুলিস। কথাটা ঠিক বলা হইলনা। ক্ষুদিরামই আগে আগে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া যেন সিপাহীদের টানিয়া আনিতেছে।

আমাদের দেখিয়া একটু হাসিল। স্নান সমাপন করিয়া আসিয়াছিল। শেষে শুনিয়াছি, খুব প্রত্যূষে উঠিয়া স্নান করিয়া কারাবাসকালীন বর্দ্ধিত চুলগুলি আঙ্গুল দিয়া বিন্যস্ত করিয়া নিকটবর্ত্তী দেবমন্দির হইতে প্রহরী কর্ত্তৃক সংগৃহীত চরণামৃত পান করিয়া আসিয়াছিল।

আমাদের দিকে আর একবার চাহিল। তারপর দৃঢ় পদবিক্ষেপে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। মঞ্চে উপস্থিত হইলে তাহার হাত দুইখানি পিছনে আনিয়া রজ্জুবদ্ধ করা হইল। একটি সবুজ রঙের

পাতলা টুপি দিয়া তাহার গ্রীবামূল অবধি ঢাকিয়া দিয়া গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দেওয়া হইল।

ক্ষুদিরাম সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এদিকে ওদিকে একটুও নড়িল না। উড্‌ম্যান সাহেব ঘড়ি দেখিয়া একটি রুমাল উড়াইয়া দিলেন। একটি প্রহরী মঞ্চের একপ্রান্তে অবস্থিত একটি হ্যাণ্ডেল টানিয়া দিল।

ক্ষুদিরাম নীচের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল। কেবল কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া উপরের দড়িটি একটু নড়িতে লাগিল। তারপর সব স্থির।

...আমরা জেলের বাহিরে আসিলাম। আধঘণ্টা পরে জেলের দুইজন বাঙ্গালী যুবক ডাক্তার আসিয়া খাটিয়া ও নূতন বস্ত্র লইয়া গেলেন।

নিয়ম অনুসারে ফাঁসির পর গ্রীবার পশ্চাৎদিকে অস্ত্র করিয়া দেখা হয় যে, পড়ামাত্র মৃত্যু হইয়াছিল কিনা। ডাক্তার দুইটি সেই অস্ত্র করা স্থান সেলাই করিয়া, ঠেলিয়া বাহির হওয়া জিহ্বা ও চক্ষু যথাস্থানে বসাইয়া, নূতন কাপড় পরাইয়া, দুইজনে খাটিয়া ধরিয়া মৃতদেহটি জেলের বাহিরে আমাদের দিয়া গেলেন।

কর্তৃপক্ষের আদেশে আমরা নির্দিষ্ট রাস্তা দিয়া শ্মশানে চলিতে লাগিলাম।

রাস্তার দুই পাশে কিছুদূর অন্তর পুলিস প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের পশ্চাতে শহরের অগণিত লোক ভিড় করিয়া আছে।

অনেকে শবের উপর ফুল দিয়া গেল। শ্মশানেও অনেক ফুল আসিতে লাগিল। একটি সাব ইনস্‌পেক্টরের নেতৃত্বে বারোজন পুলিস শ্মশানের একপ্রান্তে বসিয়া রহিল।

চিতারোহণের আগে স্নান করাইতে গিয়া ক্ষুদিরামের মৃতদেহ বসাইতে গেলাম।

দেখিলাম, মস্তকটি মেরুদণ্ডচ্যুত হইয়া বুকের উপর ঝুলিয়া

পড়িয়াছে। দুঃখ-বেদনা-ক্রোধে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মাথাটি ধরিয়া রাখিলাম। বন্ধুগণ স্নান শেষ করাইলেন।

তারপর চিতায় শোয়ানো হইলে রাশিকৃত ফুল দিয়া মৃতদেহ সম্পূর্ণ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। কেবল উহার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানি অনাবৃত রহিল।

দেহটি ভস্মীভূত হইতে বেশী সময় লাগিল না। চিতার আগুন নিভাইতে গিয়া প্রথম কলসী জল ঢালিতেই তপ্ত ভস্মরাশির খানিকটা আমার বক্ষে আসিয়া পড়িল। তাহার জন্য জ্বালা-যন্ত্রণা বোধ করিবার মত মনের অবস্থা তখন ছিল না।

আমরা শ্মশান বন্ধুগণ স্নান করিতে নদীতে নামিয়া গেলে পুলিস প্রহরীগণ চলিয়া গেল। তখন আমরা সমস্বরে 'বন্দেমাতরম' বলিয়া মনের ভাব খানিকটা লঘু করিয়া যে যাহার বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। সঙ্গে লইয়া আসিলাম একটা টিনের কৌটায় কিছু চিতাভস্ম কালিদাস বাবুর জন্য।....

ক্ষুদিরামের উত্তপ্ত দেহভস্ম-দগ্ধ শ্বেত চিহ্নটি আমার বুকের উপর এখনও রহিয়াছে, আর বুকের ভিতরে অম্লান আছে তাহার হাস্যোজ্জ্বল কচি মুখখানি।"

এবার শোন সেদিনের অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের বাংলা অনুবাদ।

'মজঃফরপুর, ১১ই আগষ্ট—অদ্য ভোর ছয় ঘটিকার সময় ক্ষুদিরামের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। ক্ষুদিরাম দৃঢ় পদক্ষেপে প্রফুল্ল চিত্তে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। এমনকি যখন তাহার মাথার উপর টুপিটি টানিয়া দেওয়া হইল, তখনো সে হাসিতেছিল।

[অমৃতবাজার পত্রিকা : ১২ই আগষ্ট : ১৯০৮ সন]

খবর শুনে শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াল গোটা বাংলা দেশ। গোটা ভারতবর্ষ। মাথা নোয়াল কোটি কোটি নির্য্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ।

হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে জেগে উঠল অজ্ঞাত কবির সেই অমর সঙ্গীত—'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।'

ক্ষুদিরাম চলে গেলেন। কিন্তু এ মৃত্যু, মৃত্যু নয়। এ হল জীবনাদর্শে উজ্জীবিত চরম আত্মোৎসর্গ। মানুষের কল্যাণই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, এভাবেই তাঁদের জীবন উৎসর্গীকৃত হয়। তাই মৃত্যুর পরেও তিনি বেঁচে রইলেন জাতির অন্তরে। বেঁচে রইলেন বাংলা কাব্য, সাহিত্য, সঙ্গাত ও ইতিহাসের পাতায়।

তারপর পৃথিবীর উপর দিয়ে দীর্ঘ একষট্টি বছর গড়িয়ে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। তা বলে আজো কি ভারতবাসী ভুলতে পেরেছে সেই মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ ক্ষুদিরামকে ?

সংসারে কেউ অমর নয়। সবাইকেই একদিন মৃত্যুবরণ করতে হয় প্রাকৃতিক নিয়মে। তা বলে মরেও এমন মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে জাতির অন্তরে বেঁচে থাকতে পেরেছেন ক'জন !

ক্ষুদিরামের মৃত্যু নেই। তাঁর মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই তিনি জাতির ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন চিরকাল। তিনি অমর। মৃত্যুঞ্জয়ী।

ক্ষুদিরাম ফাঁসিমঞ্চে প্রাণ উৎসর্গ করলেন ১১ই আগষ্ট, ১৯০৮ সন।

আর বিশ্বাসঘাতক নন্দলাল ! তার কি হল !

যার জন্য প্রফুল্ল চাকীর মত নির্ভীক তরুণকে মৃত্যুবরণ করতে হল সেকি রেহাই পেয়ে গেল বাংলার বিপ্লবীদের রোষানল থেকে ?

প্রমাণ পাওয়া গেল নভেম্বর মাসের ৯ তারিখে।

রাত তখন প্রায় আটটা। সার্পেণ্টাইন লেন ধরে নন্দলাল এগিয়ে চলেছে হাতে একতাড়া চিঠি নিয়ে। মন তার খুশিতে ভরপুর। সরকারের কাছ থেকে হাজার টাকা পুরস্কার মিলেছে। চাকরীতেও পদোন্নতি হয়েছে। সুতরাং আর তাকে পায় কে !

'দাঁড়াও নন্দলাল !'

কে ! ডাক শুনে থমকে দাঁড়াল নন্দলাল ! কে তাকে ডাকে এমন করে !

—আমরা ডেকেছি। কাছে এসে দাঁড়াল দুটি বলিষ্ঠ তরুণ।

—কি চাই তোমাদের ! নন্দলালের চোখে মুখে সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

—চাই তোমাকে পুরস্কার দিতে।

গ্রাম ! গ্রাম ! গ্রাম ! পরপর তিনটি শব্দ। ব্যস, সব শেষ। নন্দলাল খতম।

নন্দলালকে সেদিন কে এমন করে শাস্তি দিয়েছিলেন জানো কল্যাণী !

দিয়েছিলেন তখনকার সময়ের দুর্ধর্ষ বিপ্লবী নেতা স্বয়ং শ্রীশ পাল। সঙ্গে ছিলেন আরো একজন বিপ্লবী তরুণ, রণেন গাঙ্গুলী।

শুধু নন্দলাল নয়, আরো অনেক বিশ্বাসঘাতককেই শ্রীশ পাল সেদিন সায়েস্তা করেছিলেন এমনি করে। অগ্নিযুগের এক উল্লেখ-যোগ্য অধ্যায় রডা কোম্পানীর অস্ত্র লুণ্ঠনের পরিকল্পনাটিও তাঁরই উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি।

অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ কে জান কল্যাণী ?

না, ক্ষুদিরাম নয়। প্রফুল্ল চাকীও নয়। প্রথম শহীদ—প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯০৭ সনে দেওঘর সংলগ্ন রোহিনী পাহাড়ে।

উল্লাসকর দত্তের তৈরী বোমার কার্যকারীতা পরীক্ষা করতে গিয়ে সেদিন তিনি প্রাণ দিয়েছিলেম প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে।

এ খবর কেউ জানতেন না এতদিন। জানার কথাও নয়। কারণ সেই মন্ত্রগুপ্তি। ফলে অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চক্রবর্তী প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে গেছেন দেশবাসীর কাছে।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, বিভূতি সরকার প্রমুখ বিপ্লবী বৃন্দ। তাঁরাই এ খবর প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন পরবর্তী কালে।

দ্বিতীয় শহীদ প্রফুল্ল চাকী। ক্ষুদিরাম তৃতীয়। কিন্তু ফাঁসি মঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী শহীদদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম।

প্রথমে প্রফুল্ল চক্রবর্তী। তারপর প্রফুল্ল চাকী। সব শেষে ক্ষুদিরাম। সবাই একে একে চলে গেলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে নিজের কর্তব্য সুসম্পন্ন করে।

আশ্চর্য্য, এই মৃত্যু-উৎসবের মধ্যেও কিন্তু জলসার সেদিন এতটুকুও বিরাম ছিলনা কল্যাণী। বিশেষ করে আলিপুর জেলে। কত জলসা যে সেদিন সেখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তার বোধহয় কোন গোণা গুনতি নেই।

প্রথম জলসাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐতিহাসিক মানিকতলা বোমার মামলায় ধৃত বন্দীমহলে।

তবে এ ব্যাপারে তাদের কোন সময় অসময় ছিলনা। বিশেষ একটি মানুষের দেখা পেলেই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যেতো তাদের গানের জলসা।

'ওগো সরকারের শ্যাম তুমি
আমাদের শূল
কবে ভিটেয় চড়বে ঘুঘু
দেখবে চোখে সর্ষে ফুল।'

কে এই সরকারের শ্যাম ?

তাকে সর্ষে ফুল দেখানোর জন্য বন্দীদের এত আগ্রহ কেন ?

এর মূলে রয়েছেন সেই ক্ষুদিরাম।

বিস্ফোরণ ঘটল মজঃফরপুরে, কিন্তু তার ঢেউ এসে লাগল কলক।তার
ফলে অরবিন্দ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়,

হেম দাস, নরেন গোঁসাই, সত্যেন বসু, কানাইলাল দত্ত ইত্যাদি আরো অনেককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে একে একে। শুরু হয়েছো অভিযোগিক মানিকতলা বোমার মামলা।

বন্দীরা নির্বিকার। গানে-গল্পে আনন্দে-উচ্ছ্বাসে সর্বক্ষণই তারা ভরপুর। দেখে কে বলবে যে তারা বন্দী। মনে হয় একটা বিরাট একান্নবর্তী সুখী পরিবার যেন।

সহসা সেই সুখী পরিবারে ভাঙন ধরল।

বিশ্বাসঘাতকতা করল নরেন গোঁসাই। শোনা গেল সে নাকি গোপনে পুলিসের কাছে স্বীকারোক্তি করেছে। শুধু একদিন নয়, পর পর ছয় দিন বিবৃতি দিয়েছে। কিছুই আর বলতে বাকি রাখেনি।

অনিবার্য ফল ফলতে দেরি হয়নি। সহকর্মীদের মধ্যে এতদিন যাঁরা ছিলেন বাইরে, এবার তাঁরাও এসে ভীড় জমিয়ে তুললেন কারা-প্রাচীরের অন্তরালে।

এলেন চন্দননগর ডুপ্লে কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র রায়। এলেন ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিলকৃষ্ণ রায়, যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ দাস, বিজয় ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু ও আরো অনেকেই।

বন্দীরা অবাক। ,নরেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে,—এ যে বিশ্বাস করাও শক্ত। ঠিক আছে, ডাকো নরেনকে। ওকেই বরং জিজ্ঞেস করা যাক।

কিন্তু কোথায় নরেন!

সতর্কতা হিসেবে পুলিস তাকে আগেই সরিয়ে নিয়েছে জেল হাসপাতালের এক ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে। পাশে রয়েছে সদাসতর্ক প্রহরী হিগিন্‌স্‌ ও অন্য একজন শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডার। এইসব স্বদেশীওয়ালাগুলোকে বিশ্বাস নেই। কখন যে কি করে বসবে ঠিক কি। সুতরাং সাবধানতা ভাল।

হাঁপানী রোগের জন্য সত্যেন তখন হাসপাতালে। খবর শুনে মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল তার। ওকে আমি খুন করব। শুধু চাই একটা রিভলবার।

কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? জেলের অভ্যন্তরে রিভলবার আসবে কি করে?

হবে হবে। অত ব্যস্ত কেন। অভয় দিলেন প্রবীণ বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাস। তবে হুঁশিয়ার। কথায় বলে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। তাই কথাটা যেন দু-একজন ছাড়া আর কেউ জানতে না পারে। বারীনকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। এমন কি অরবিন্দও নয়। সে এখন অন্য জগতের মানুষ। এসব ব্যাপারে জড়িয়ে তার শান্তিভঙ্গ করা ঠিক হবে না।

কিন্তু একটা কথা কল্যাণী। স্বীকারোক্তি অন্যতম নেতা বারীন ঘোষও সেদিন করেছিলেন। পরে উল্লাসকর দত্ত, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই করেছিলেন। বারীন ঘোষ একথাও স্বীকার করেছিলেন যে, তিনিই কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্ল চাকীকে পাঠিয়েছিলেন মজঃফরপুরে। মুরারী পুকুর বাগানে প্রাপ্ত বোমা-পিস্তল সম্বন্ধেও তিনি নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করেননি।

তাহলে নরেন গোঁসাই-এর স্বীকারোক্তির মধ্যে অন্যায়টা হল কোথায়?

অন্যায় আছে বৈকি। স্বয়ং অরবিন্দ, হেমচন্দ্র দাস প্রমুখ সবাই নিষেধ করা সত্বেও বারীন ঘোষ স্বীকারোক্তি করেছিলেন, একথা সত্য। কিন্তু স্বীকারোক্তি করা, আর রাজসাক্ষী হওয়াটা এক কথা নয়।

বারীন ঘোষ, উল্লাসকর বা উপেন ব্যানার্জীর স্বীকারোক্তির মধ্যে নিজেদের বাঁচাবার কোন প্রচেষ্টা ছিল না। ছিল সব কিছু দায়িত্ব নিজেদের মাথায় টেনে নেবার চেষ্টা। বারীন ঘোষের ভাষায়:

'আমাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। একটা মৃতপ্রায় জাতিকে কি করে সাহসের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করতে হয়, তা আমরা দেখাতে চেয়েছিলাম। আমাদের কাজ শেষ। এবার আমাদের ছুটি।'

'Who did not mean or expect to liberate our country by killing a few English men. We wanted to show peaple how to dare and die.'

শুধু তাই নয়। কি বারীন ঘোষ, কি উল্লাসকর দত্ত, কি উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়—সবারই সেদিন একমাত্র চেষ্টা ছিল অরবিন্দকে আড়াল করে রাখা। নিজেদের ফাঁসি হোক তাতে কোন দুঃখ নেই, তবু অরবিন্দকে যেন কোন কিছু স্পর্শ না করে।

ঠিক তার বিপরিত হল নরেন গোঁসাইয়ের স্বীকারোক্তি। তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, অরবিন্দসহ সবাইকে ফাঁসিয়ে দিয়ে নিজেকে রক্ষা করা। তফাৎ এইখানেই। যাক, পরের কাহিনী শোন।

প্ল্যান মত রিভলবার এসে গেল বাইরে থেকে।

দেখে এতটুকুও খুশী হতে পারলেন না সত্যেন। উঁহু, চলবে না, যেমন বেয়াড়া সাইজ, তেমনি পুরনো মডেল। তাছাড়া জায়গায় জায়গায় মরচে-ধরা। কাজের সময় বিগড়ে যাবে কিনা কে জানে। ঠিক আছে, এটা রইল, তবে নতুন মডেলের আর-একটা ভাল জিনিস চাই।

তাও একদিন এসে গেল জেলের অভ্যন্তরে। ভাল করে কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে অবশেষে তাকে তুলে দেওয়া হল কানাই দত্তর হাতে। সত্যেন অসুস্থ। এই ফলমূলগুলো তাকে জেল হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এসো।

অদ্ভুত নিরলস কর্মী কানাই। যেমন মেধাবী, তেমনি বিশ্বস্ত। এর আগের বারও তিনি এই মূল্যবান ফলমূলগুলো পৌঁছে দিয়েছিলেন সত্যেনের কাছে।

যেতে যেতে এবার কিন্তু দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল কানাইয়ের।

পুঁটলীটা কেমন যেন ভারী ভারী ঠেকছে। কি আছে ভেতরে! উঁহু, এ তো ফলমূল নয়।

আরে! এ যে একেবারে আসল ফলমূল দেখছি। আমাকে ফাঁকি দিয়ে তলে তলে তাহলে একটা কিছু প্ল্যান করা হচ্ছে! ঠিক আছে বাবা, আমিও কানাইলাল। দেখব, কি করে আমাকে এড়াতে পার।

সত্যিই এড়ানো গেল না। বাধ্য হয়েই তখন সত্যেনকে সব কথা খুলে বলতে হল এক এক করে। শুনেই লাফিয়ে উঠলেন কানাই। 'আমাকে সঙ্গে নিতে হবে'।

—পাগলামো করিসনে ভাই। বোঝাতে চেষ্টা করলেন সত্যেন, আমি অসুস্থ। আজ আছি তো কাল নেই। প্রফুল্ল চলে গেছে। নিজের হাতে গড়া প্রিয় শিষ্য ক্ষুদিরামও হারিয়ে গেছে। কি হবে আমার বেঁচে থেকে! তাই আমাকেই এবার যেতে দে।

কে কার কথা শোনে। কানাই নাছোরবান্দা। আমরা পড়ে থাকব, আর তুমি মজাসে ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবে, ওসব চলবে না বাবা। কাজেই হয় আমাকে সঙ্গে নাও, নয়তো তোমার এই ফলমূল সব বাজেয়াপ্ত।

অগত্যা রাজী হলেন সত্যেন। বেশ তাই হোক। দুজনেই থাকব। পয়লা সেপ্টেম্বর মামলার তারিখ। ওইদিন নরেন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক বিবৃতি দেবে বলে জানিয়েছে। সে সুযোগ আর দেওয়া হবে না। তার আগেই তাকে শেষ করে ফেলতে হবে।

—নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গেই কানাই রাজী। শুভ কাজে আর দেরি করে লাভ কি।

কিন্তু তার নাগাল পাবার উপায় কি?

হাসপাতালের সাধারণ ওয়ার্ড আর ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ড এক নয়। দিব্যি জামাই-আদরে এখন সে ওখানে রয়েছে। পাশে রয়েছে সদাসতর্ক প্রহরী হিগিন্‌স্। তাকে কাছে পেতে হবে তো।

এবার টোপ ফেললেন সত্যেন। নরেনের মত আমিও রাজসাক্ষী হব। আমিও বিবৃতি দেব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। এ বিষয়ে নরেনের সঙ্গে আমার একটু আলাপ আলোচনা করা প্রয়োজন। দুজনের বিবৃতি এক হতে হবে তো। নইলে মামলা ফেঁসে যাবে যে। সুতরাং ওদিন ভোরে তোমরা আমার কাছে নরেনকে একবার নিয়ে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে টোপ গিলল পুলিস। বাঃ! 'এ তো সুখের কথা। ঠিক আছে, ওইদিন আমরা নরেনকে তোমার কাছে নিয়ে আসব।

মজা হল আগের দিন সন্ধ্যায়। দেখা গেল চোখ বুজে পদ্মাসন করে বসে কানাই নিজের মনে কি যেন সব বলছে বিড় বিড় করে।

সবাই অবাক। কি হল ওর! এই আবোল-তাবোল কথাগুলোর মানে কি!

—আঃ! বিরক্ত করো না। ধমকে উঠলেন কানাই, আমি শব-সাধনা করছি।

শব-সাধনা! সবাই হতভম্ব। কি ব্যাপার! হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল নাকি ছেলেটা।

ঠিক তাই। যাকে বলে একেবারে ভয়ানক অসুস্থ। সেই সঙ্গে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। সুতরাং ডাকো ডাক্তারকে। সে এসে রোগীকে এক্ষুনি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করুক। নইলে ভাল-মন্দ কিছু একটা ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়।

বটেই তো। ওদিকে লগ্ন আসন্ন। কাল ভোরেই নরেন আসবে সত্যেনের সঙ্গে দেখা করতে। ও সময়ে কাছাকাছি থাকতে হবে তো। কাজেই রোগী না সেজে আর উপায় কি!

পরদিন ভোরেই নরেন এসে হাজির। সতর্কতা হিসেবে সঙ্গে এল হিগিন্‌স্ ও অন্য একজন শ্বেতাঙ্গ প্রহরী।

কাগজ-কলম নিয়ে সত্যেন আগে থেকেই প্রস্তুত। ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কি কি বলতে হবে সব লিখে নিতে হবে তো।

কিন্তু তুমি বাপু সামনে দাঁড়িয়ে রইলে কেন হিগিন্‌স্? নিরিবিলিতে আমাদের একটু কথাবার্তা বলতে দেবে তো। তোমার ঐ দোসরকে নিয়ে একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও না।

দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গে সঙ্গেই হিগিন্‌স্ বেরিয়ে গেল সহকারীকে নিয়ে। সত্যিই তো। একটু চান্স না পেলে ওরা নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করবে কি করে!

শুরু হল কথাবার্তা। বক্তা অবশ্য নরেন একাই। আমার বাবাকে জানিস তো। যাকে বলে একেবারে মামলার পোকা। বাবা বলেছেন সব কথা খুলে বললেই আমি খালাস পেয়ে যাব। তারপর চলে যাব সোজা বিলেত।

—বিলেত! সত্যেনের এক হাত তার জামার পকেটে। সেই অবস্থায়ই তিনি রহস্যময় কণ্ঠে বললেন,—বিলেত না গিয়ে আর কোথাও গেলে হত না!

—তার মানে। নরেন অবাক। বিলেত ছাড়া আর কোথায় যাওয়া যেতে পারে?

—কেন, যমের বাড়ি? বলতে না বলতেই জামার পকেট থেকে সত্যেনের রিভলবার গর্জে উঠল—দ্রাম!

—ওরে বাপরে! এক হাতে উরু চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে ছিট্‌কে বেরিয়ে গেল নরেন। দ্বিতীয়বার গুলি করার মত আর কোন অবকাশই পাওয়া গেল না।

তা বলে কি সে রেহাই পেয়ে গেল?

মোটেই না। নীচে কানাই তখন প্রস্তুত। হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দিব্যি ভালমানুষের মত তখন তিনি দাঁতন করে চলেছেন মস্ত বড় একটা নিমের ডাল দিয়ে।

কান দুটো কিন্তু খাড়াই আছে। নরেন এসে গেছে। ওঃ! কি মজাটাই না হবে আজ। 'এখন দোতলা থেকে একটা সিগন্যাল পেলেই, ব্যস্।

—না। কানাই নির্বিকার,—অসংখ্য ধন্যবাদ।

সাজা হল প্রাণদণ্ড। হাইকোর্টও সে-সাজা বহাল রাখলেন।

রাখাই স্বাভাবিক। দেশটা তাদের না হলেও তারাই এ দেশের মালিক। তাদের অবাধ শোষণে যারা বাধা দিতে চায়, বিচারের নামে তাদের হত্যা করার এমন সুযোগ কি কখনো ছেড়ে দিলে চলে! ইংরেজ অত বোকা নয়।

গানে-গল্পে আনন্দে-উচ্ছ্বাসে কানাই তেমনি ভরপুর। ইতিমধ্যে তার বোল পাউণ্ড ওজন বেড়েছে। দেখে কে বলবে যে ফাঁসির অপেক্ষায় সে দিন গুণছে। বিশ্বাসই যেন হয় না।

শেষ দেখা দেখতে এলেন দাদা আশুতোষ দত্ত। সঙ্গে অশ্রুমুখী মা।

কানাই হেসেই খুন। এ্যাদ্দিন তুমি ছিলে আমার মা। আর আজ! আজ সারা বাংলাদেশের মা। এ কি কম ভাগ্যের কথা! কি বল মা? ঠিক বলিনি? তবে?

১৯০৮ সন, ১০ই নভেম্বর। তখনো ভাল করে রাতের অন্ধকার মেলায়নি।

একে একে এসে হাজির হলেন পুলিস কমিশনার হ্যালিডে, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বস্পাস, জেল-সুপার এমারসন এবং ছোট-বড় আরো অনেকেই।

আজ কানাইয়ের শেষ দিন। পররাজ্যলোভী বিদেশী শাসকদের প্রতিহিংসার বলি হিসেবে প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর কানাইকে আজ মাটির পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়ে চলে যেতে হবে।

আয়োজনের ক্রটি নেই। জেল-পুলিস ছাড়াও বাইরে থেকে আরো তিনশত সশস্ত্র পুলিস এনে জমায়েত করা হয়েছে জেলের অভ্যন্তরে। জেলের কড়া শাসনে থেকেও যারা তলে তলে এতবড় কাণ্ড ঘটাতে পারে, তাদের বিশ্বাস কি! সুতরাং সতর্ক থাকা ভাল।

কানাই তেমনি নির্বিকার। তেমনি সদাহাস্যময়। ফাঁসি-মঞ্চে তোলার পরে প্রশ্ন করা হল,—কিছু বলার আছে তোমার?

—না, ধন্যবাদ। হেসে জবাব দিলেন কানাই। সেই হাসি, যে হাসি বরাবর সে হেসে এসেছে।

নিজের কর্তব্য সুসম্পন্ন করে কানাই চলে গেলেন। এ মৃত্যু বীরের মৃত্যু, তাই জেল-গেটের বাইরে সেদিন দেখা গেল এক বিচিত্র দৃশ্য। যেদিকে তাকানো যায় শুধু মানুষ আর মানুষ। বীর কানাইকে তারা শুধু শেষবারের মত একটু দেখতে চায়। দেখে ধন্য হতে চায়।

শবদেহ বাইরে আসতেই শুরু হল অবিরাম শঙ্খধ্বনি। শুরু হল মহিলাদের লাজবর্ষণ। বীর কানাই, তোমার মৃত্যু নেই। তোমাকে আমরা কোনদিনই ভুলব না। তুমিই আমাদের নির্ভয় হতে শিখিয়েছ।

শোভাযাত্রা ক্রমশঃ এগিয়ে চলল কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে।

সে কি অন্তহীন মানুষের মেলা! বৃদ্ধ-শিশু বাঙালী-অবাঙালী কেউ বাদ নেই। সবাই পুষ্পবর্ষণ করে চলেছে একটানা। রাস্তার দু পাশের বাড়িগুলো থেকেও পুষ্পবর্ষণের বিরাম নেই। কানাইয়ের স্পর্শ-ধন্য সেই পুষ্প-স্তবক সংগ্রহের ব্যাপারেও কারো কারো উৎসাহের অন্ত নেই। এ যে দেবতার প্রসাদী ফুল। এ ফুল কপালে ছোঁয়ালেও পুণ্য হয়।

সবশেষে মায়ের প্রসাদী মালা নিয়ে এগিয়ে এলেন কালীঘাটের পূজারী ব্রাহ্মণগণ। কানাই যে আমাদের পাগলী মায়ের পাগল ছেলে। এ-মালা কি ওকে ছাড়া কার কাউকে মানায়!

ব্যাপার দেখে মনে মনে ভয় পেয়ে গেল শাসক-সম্প্রদায়। এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। চিরদিনের শান্ত ও নিরীহ মানুষগুলো আজ এমন করে উদ্বেল হয়ে উঠেছে কিসের প্রেরণায়!

প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন—ওরা যে ওদের নিস্তরঙ্গ দীঘির জলে এমন করে ঢেউ তুলবে, তা বুঝি তাদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

আবার সেই একই দৃশ্য দেখা গেল ২১শে নভেম্বর ভোর পাঁচটায়। এবার ফাঁসি-মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন সত্যেন।

তবে এবার আর আগেকার ভুলের পুনরাবৃত্তি করলেন না শাসক-সম্প্রদায়। তাই উদ্বেলিত জনতার হাতে শবদেহ না দিয়ে নিজেরা তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে। ঘুমন্ত দৈত্য জেগে উঠেছে। বাঙালীকে আর বিশ্বাস নেই।

প্রফুল্ল, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, সবাই চলে গেলেন একে একে।

বাকী রইলেন অরবিন্দ, বারীন ঘোষ, উল্লাসকর, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ বন্দীর দল। সবাইকে আসামী তালিকাভুক্ত করে দিনের পর দিন মামলা এগিয়ে চলল এডিশনাল জজ মিঃ বীচক্রফট্‌-এর আদালতে।

মামলার রায় জানা গেল ১৯০৯ সনের ৬ই মে।

বারীন ঘোষ ও উল্লাসকরকে দেওয়া হয়েছে মৃত্যুদণ্ড।

আর উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম দাস, বিভূতি সরকার, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল, ইন্দুভূষণ রায়কে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

পরেশ মৌলিক, নিরাপদ রায় ও শিশির ঘোষের দশ বছর কারাদণ্ড। অশোক নন্দী, বালকৃষ্ণ হরিকানে আর শিশির সেনের সাত বছর। কৃষ্ণজীবন সান্যাল এক বছর। বাকী সবাই মুক্ত।

অরবিন্দও মুক্তি পেলেন, তবে তখন তিনি আর শুধু বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ নন। কারাজীবনের নির্জন অবকাশে ইতিমধ্যেই কখন বিপ্লবী অরবিন্দর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ,—নাম তার 'ঋষি অরবিন্দ'।

এ ব্যাপারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অবদান ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আসামী পক্ষের প্রধান কৌঁসুলী হিসেবে অরবিন্দকে সমর্থন করতে গিয়ে সেদিন আদালত গৃহে তিনি যে ঐতিহাসিক

সওয়াল করেছিলেন, অগ্নিযুগের ইতিহাসে তা অম্লান, অক্ষয় হয়ে থাকবে চিরকাল।

মামলার শেষ শুনানীর দিন বিচারক এবং জুরীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন :

'My appeal to you, therefore, is that a man like this who is being charged, charged with the offence with which he has been charged, stands not only before the bar in this court, but stands before the bar of the High Court of history and my appeal to you in this : That long after the controversy will be hushed in silence, long after this turmoil, the agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will he looked upon as the poet of patriotisom, as the prophet of nationalism and lover of humanity.......'

'আপনারা মনে করবেন না যে, আজ এই আদালতেই এই মামলার শেষ। মানব ইতিহাসের বিরাট বিচারালয়েও এই মামলার শুনানী চলবে চিরকাল।

একদিন যখন আপনাদের সমস্ত বিচার বিতর্ক নীরব হয়ে যাবে, যখন আজকের এই আন্দোলন ও উত্তেজনার কোন চিহ্নই অবশিষ্ট থাকবে না, এবং আজ যিনি আসামী হয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন তিনিও পৃথিবী থেকে চলে যাবেন, সেদিন সেই অনাগত যুগের মানুষ এই অরবিন্দকেই স্মরণ করবে দেশপ্রেমের কবি বলে। মানবতার উপাসক বলে সমগ্র পৃথিবী তাকেই দেবে সেদিন পুষ্পাঞ্জলি।

আজ যে বাণী প্রচারের জন্য তিনি অভিযুক্ত হয়েছেন, সেদিন সেই বাণীর তরঙ্গ দেশ দেশান্তরের মানুষের অন্তরে মহাভাবের প্রতিধ্বনি জাগিয়ে তুলবে।

দেশবন্ধুর সেই ভবিষ্যৎ বাণী ব্যর্থ হয়নি কল্যাণী। তাই সেদিনের বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ আজ লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষের কাছে 'ঋষি অরবিন্দ'।

রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হল হাইকোর্টে।

ফলে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। হেম দাস ও উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়েরও তাই।

অন্যান্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদের দেওয়া হল দশ বছর, আর বালকৃষ্ণ হরিকানে, ইন্দ্রনাথ নন্দী, সুনীল সেন ও কৃষ্ণ জীবন সান্যাল পেলেন মুক্তির আদেশ।

সরকার বাহাদুর মহাখুশী। ঝামেলা চুকে গেছে। চারিদিকে এখন বেশ চুপচাপ। ডাণ্ডা খেয়ে বাছাধনরা একেবারেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সব চাইতে বেশি খুশী হলেন সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস আর গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা শামসুল আলম।

বিপ্লবীদের সাজা দেবার ব্যাপারে সে কি তাদের অন্তহীন উদ্যম! সে কি তাদের অফুরন্ত উৎসাহ! ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি! সেদিনের ছেলে হয়ে তোরা এসেছিস কিনা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে! চালাকী পায়া হ্যায়! এবার শিক্ষা হল তো! যা, এখন আন্দামানে গিয়ে টু-টু করে চরে বেড়াগে।

না, এজন্য সরকারের কাছ থেকে তাদের কোন প্রত্যাশা নেই। এ তো তাদের মহৎ কর্তব্য। তাছাড়া হুজুরের দয়ায় পয়সার তাদের অভাব নেই।

তবে যদি বড়দিন উপলক্ষ্যে খেতাব-বিতরণের সময় গরীবদের কথা হুজুর একটু মনে রাখেন তো আজীবন তারা হুজুরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

তা থাকুক। আজীবন কেন, পরজন্মে কৃতজ্ঞ থাকলেও তাতে কারো কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই।

কিন্তু বাংলাদেশে যেমন বুনো ওল আছে, তেমনি বাঘা তেঁতুলেরও অভাব নেই। তারা কি সে অবকাশ দেবে ওদের!

সত্যিই অবকাশ দিল না। বাড়াবাড়ি দেখে হঠাৎ একদিন গর্জে উঠলেন বাংলার তরুণ দল। আপদ দুটোকে সরিয়ে দিতে হবে।

একজন সরকারী উকীল আশুতোষ বিশ্বাস। অন্যজন গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা শামসুল আলম।

সরকারের শ্যামটিকে এতক্ষণে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছ তুমি।

শামসুল আলম। এই শামসুল আলমকে দেখলেই বন্দীরা সেদিন সমস্বরে গান ধরতেন :

'ওগো সরকারের শ্যাম তুমি
আমাদের শূল
কবে ভিটেয় চরবে ঘুঘু
দেখবে চোখে সর্ষে ফুল।'

ভেতরে ভেতরে কিন্তু চোখে সর্ষে ফুল দেখাবার ব্যবস্থা ততক্ষণে হয়ে গেছে কল্যাণী।

একজনকে নয়, দুজনকেই। শুধু সুযোগের অপেক্ষামাত্র।

সুযোগ পাওয়া গেল ১৯০৯ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী।

কলকাতা হুবার্বন পুলিসের আদালত। কাজ শেষ করে বাইরে বেরিয়ে আসছেন সেই সরকারী উকীল আশুতোষ বিশ্বাস।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে রিভলবার গর্জে উঠল—ত্রাম! ত্রাম! ত্রাম! বাস, সঙ্গে সঙ্গেই শেষ।

ঘটনাস্থলেই ধরা পড়লেন আততায়ী চারুচন্দ্র বসু।

কিন্তু একি! কাণ্ড দেখে পুলিস অবাক। আসামীর ডান হাতটা একেবারেই পঙ্গু। পঙ্গু বলেই রিভলবারটাকে সে শক্ত করে

বেঁধে নিয়েছে ডান হাতের তালুতে। তারপর যা কিছু করেছে, সবই বাঁ হাতে। বিশ্বাস করাও শক্ত।

সত্যিই অদ্ভুত ছেলে ছিলেন খুলনার 'শোভনা' গ্রামের কেশব বসুর ছেলে এই চারু বসু। নাম মাত্র মাইনের হাওড়া হিতৈষী প্রেসে কাজ করতেন। থাকতেন বস্তীর একটা খোলার ঘরে মাসিক আট আনা মাত্র ভাড়া দিয়ে। খাওয়া-দাওয়া সবই হোটেলে।

এই ভয়াবহ কৃচ্ছসাধনের মধ্যে থেকেও নিজের পঙ্গু হাত নিয়ে তিনি যে অসাধ্যসাধন করেছিলেন, সংসারে তার তুলনা কোথায় বল!

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বস্পাসের আদালতে শুরু হল মামলা। আসামী চারু বসু একা। কোন আইনজীবীর প্রয়োজন নেই তার।

—সরকারী খরচে কোন উকিল রাখতে চাও কি? প্রশ্ন করলেন মহামান্য আদালত।

—না, ধন্যবাদ। মামলার শেষ পরিণতি যে কি হবে তা আপনিও জানেন, আমিও জানি। তাহলে কি লাভ ওসব ভড়ং দেখিয়ে সময় নষ্ট করে। তার চাইতে যা করার, তাড়াতাড়ি করে ফেলুন।

তাই করা হল। সাজা দেওয়া হল প্রাণদণ্ড। সে আদেশ কার্যকরী করা হল ১৯শে মার্চ আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে।

চারু বসু সম্বন্ধে এবার একটি বিশেষ ঘটনার কথা তোমাকে বলব কল্যাণী।

প্রতি বছর আমাদের দেশে ৩০শে জানুয়ারী 'শহীদ দিবস' পালন করা হয় সে কথা তুমিও জান।

এবারও হয়েছে। আলিপুর এবং প্রেসিডেন্সি—উভয় জেলের ফাঁসি-মঞ্চ থেকেই সেদিন শ্রদ্ধা-নিবেদন করা হয়েছে স্বাধীনতা-সংগ্রামের শহীদদের উদ্দেশ্যে।

আশ্চর্য, ফাঁসি-মঞ্চে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন কোথাও তাদের মধ্যে চারু বসুর নাম উচ্চারিত হল না।

না আলিপুর জেলে, না প্রেসিডেন্সিতে। আলিপুর জেলে বলা হল—চারু রায়। একই লোক প্রেসিডেন্সিতে গিয়ে হলেন—চারু ঘোষ। আর গোপীনাথ সাহার ফাঁসি নাকি ১৯২৪ সনে হয়নি, হয়েছিল ১৯৩১ সনে।

উভয় অনুষ্ঠানেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম, কিন্তু তা গ্রাহ্য হয়নি।

সুতরাং সবার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদন করা হলেও হতভাগ্য শহীদ চারু বসু সেদিন অপাংক্তেয় হয়েই রইলেন সবার কাছে।

কিন্তু ইতিহাস? ইতিহাস কি বলে?

কি বলে সেদিনের আইন-আদালতের পুঁথি-পত্র?

কি বলে জেল-রেকর্ড?

সর্বজনশ্রদ্ধেয় হেমচন্দ্র ঘোষ, ডাঃ যাদুগোপাল মুখার্জী, ভুপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়, নলিনীকিশোর গুহ, পঞ্চানন চক্রবর্তী প্রমুখ বিপ্লবী নায়কগণই বা কি বলেন এ সম্বন্ধে?

আলিপুর জেলে প্রাণ-উৎসর্গকারী শহীদের নাম কি চারু বসু নয়। নাকি চারু রায়, বা ঘোষ?

আর গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়েছিল কি ১৯৩১ সনে?

জানি না চারু বসুর নামটা সেদিন এভাবে এড়িয়ে যাবার পেছনে কোন রাজনৈতিক চাল ছিল কি না। তবে থাকাটা বিচিত্র নয়।

এই খেলাই তো চলছে আজ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে। অমুক! হ্যাঁ সে আমাদের দলের শহীদ, সুতরাং সে কুলীন ব্রাহ্মণ। আর অমুকে! উহুঁ, আমাদের পার্টির সে কেউ নয়। সুতরাং শহীদ-কুলে সে পতিত।

আর যদি নেহাত জনমতের চাপে পড়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু করতে হয় তো তার মধ্যেও সেই রাজনৈতিক চাল।

যেমন দেখা গিয়েছিল ১৯৬৬ সনের ১৫ই আগষ্ট রাইটার্স বিল্ডিংএর অলিন্দে বিনয়, বাদল ও দীনেশের প্রতিকৃতি স্থাপনের ব্যাপারে।

সেদিন প্রফুল্ল সেন মন্ত্রীসভা যে একেবারে শেষ মুহূর্তে কি ভাবে সেই অনুষ্ঠান বানচাল করে দিয়েছিলেন, সে কথা তো তুমিও জান।

সেই প্রতিকৃতি স্থাপিত হল তার এক বছর বাদে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী-সভার হেমন্ত বসুর উদ্যোগে ও মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর সভাপতিত্বে।

কিন্তু এক বছর আগে হতে বাধা কি ছিল?

কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত নির্দিষ্ট দিনে শহীদদের প্রতিকৃতি স্থাপিত হলে?

পরের বছর ৮ই ডিসেম্বর রাজ্যপাল ধরমবীর নিজে এসে সর্বাগ্রে মাল্যদান করেছিলেন বিনয়-বাদল-দীনেশের প্রতিকৃতিতে।

তাতে কি ফোস্কা পড়েছিল তাঁর গায়ে? নাকি জাত গিয়েছিল তাঁর?

তাহলে কেন এই হীনমন্যতা? কেন এই চিত্তদারিদ্র্য?

এ জিজ্ঞাসা শুধু আমার নয়, তোমার আমার—সবার।

আমরা সাধারণ মানুষ। রাজনীতি বা দলবাজী, কোনটার সঙ্গেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নই। আমাদের কাছে সব শহীদই এক ও অভিন্ন। সবাইকেই আমরা শ্রদ্ধা করি সমান ভাবে। সেখানে মাতঙ্গিনী হাজরা বা সূর্য সেনের মধ্যে কার অবদান বেশী, সে-কথা আমরা চিন্তাও করিনি কোনদিন। করতে অভ্যস্তও নই।

তাহলে কেন এই অন্যায় পক্ষপাতিত্ব? কেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শহীদদের নিয়ে এই অশোভন চালবাজী?

সামান্য একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১৯৪৯ সনের এপ্রিল মাসের কথা। ঠিক হল মজঃফরপুরে শহীদ ক্ষুদিরামের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হবে।

কিন্তু ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবে কে! ক্ষুদিরাম ফাঁসি মঞ্চে প্রাণ উৎসর্গকারী প্রথম শহীদ। সেখানে কোন রকম ত্রুটি থাকলে চলবে কেন! সুতরাং আমন্ত্রণ জানানো হল জহরলালকে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী সংগ্রামী পুরুষ জহরলালকে

অস্বীকার করলেন জহরলাল। কারণ দেশের মুক্তির জন্ত ক্ষুদিরাম ফাঁসি মঞ্চে জীবন উৎসর্গ করলেও তিনি অহিংস নীতিতে আস্থাবান ছিলেন না। সুতরাং সে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়!

কি লজ্জা! কি লজ্জা! কিন্তু লজ্জাটা কার বলতে পার কল্যাণী! ক্ষুদিরামের, না আমাদের! এর পরেও মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ ক্ষুদিরামের নাম উচ্চারণ করার মত কোন অধিকার আমাদের থাকা উচিত কি?

তবে জহরলালকে এজন্য কোন দোষ দেওয়া চলেনা কল্যাণী। কারণ সখের রাজনীতি আর বিপ্লববাদ এক নয়। প্রথমটাতে হাত-তালি আর ফুলের মালা দুই-ই জোটে কিন্তু পরেরটাতে হয় ফাঁসি, নয়তো দ্বীপান্তর, এর মাঝামাঝি কোন কথা নেই। জহরলালকে কোন দিনই সে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। সুতরাং কত বড় মনের জোর থাকলে যে মানুষ স্বেচ্ছায়, হাসতে হাসতে ফাঁসির রজ্জু বরণ করে নিতে পারে, সে অনুভূতি তাঁর না থাকাটাই স্বাভাবিক।

দোষ স্মৃতিরক্ষা কমিটির। কেন সেদিন তাঁরা আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিলেন জহরলালকে! বাংলা দেশে আজো ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্য মহারাজ, হেমচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ মহাবিপ্লবীগণ বেঁচে রয়েছেন। তাঁরাই কি ক্ষুদিরামের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী নন?

যাক্, দলবাজীর এই কচকচি ছেড়ে চল আমরা বরং ফিরে যাই আমাদের সেই আগেকার কথায়।

মোট দুটি লোকের নাম উঠেছিল সেদিন বিপ্লবীদের তালিকায়। আশুতোষ বিশ্বাস ও গোয়েন্দা দপ্তরের বড়কর্তা শামসুল আলম।

আশুতোষ বিশ্বাসের ভিটেয় আগেই ঘুঘু চরানো হয়েছে। এবার এল সরকারের শ্যাম শামসুল আলমকে চোখে সর্ষে ফুল দেখাবার পালা।

সর্ষে ফুল দেখানো হল ১৯১০ সনের ২৪শে জানুয়ারী।

স্থান—কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি হ্যারিংটনের আদালত থেকে বেরিয়ে শামসুল আলম নীচে নামতে শুরু করেছেন সিঁড়ি বেয়ে। আর মাত্র কয়েক ধাপ বাকী।

হঠাৎ কান-ফাটানো আওয়াজ—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

সঙ্গে সঙ্গে চোখে সর্ষে ফুল দেখে নীচে গড়িয়ে পড়লেন শামসুল আলম।

প্রমাণিত হল যে বন্দীদের গাওয়া সেই কোরাস গান নিছক ফাঁকা আওয়াজ নয়। কথায় ও কাজে তারা এক ও অভিন্ন।

কাণ্ড দেখে হৈ-চৈ পড়ে গেল গোটা হাইকোর্ট জুড়ে। ছুটে এলেন বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্স, অ্যাডভোকেট জেনারেল মিঃ কেনরিক, এবং ছোট বড় আরো অনেকেই। ঐ যে আততায়ী পালাচ্ছে। শীগ্‌গীর ধর ওকে।

ভরসা পেয়ে প্রথমেই ছুটে গেল অস্ত্রধারী পুলিস ধুরা সিং। সঙ্গে সঙ্গেই—ড্রাম। নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল ধুরা সিং। আর তার কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

তবু শেষরক্ষা হল না। এবার দুদিক থেকে আক্রমণ করল হাইকোর্টের দুই চাপরাশী রামঅধীন সিং ও রামজানি সিং। ওদিকে পিস্তলের গুলি তখন শেষ। এ অবস্থায় আততায়ী বীরেন দত্তগুপ্তকে কাবু করা খুব একটা কষ্টকর হল না ওদের পক্ষে।

বিচার শুরু হল চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহোর আদালতে। তারপর সেই একই দৃশ্য। উকিল নেই কেন? উকিল চাও কি?

—না, দরকার হবে না। সেই একই উত্তর দিলেন বীরেন, দরকার হলে ওটা আমি নিজেই চালিয়ে নিতে পারব। জেরা করতে হয় তো আমিই করব। ডাকুন আপনার সাক্ষীদের।

শুরু হল সাক্ষ্য দেবার পালা। বিরাট বিরাট সব সাক্ষী। বিদ্যা বুদ্ধিতে তাদের নাগাল পাওয়া দায়। প্রথমেই এল চাপরাশী রামঅধীন সিং।

—আমার দিকে একবার তাকাও। জেরা শুরু করলেন বীরেন।

কথাটা শুনতেই যেন পেল না রামঅধীন সিং। করুণ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল বিচারপতি স্নুইনহোর মুখের দিকে।

—বলছি আমার দিকে তাকাও। দৃঢ়তা ফুটে উঠল বীরেনের কণ্ঠে। কে কার কথা শোনে। একই ভাবে সে তাকিয়ে রইল বিচারপতি স্নুইনহোর মুখের দিকে।

—কানে শুনতে পাও না নাকি? এবার ধমকে উঠলেন বীরেন, শীগ্‌গীর আমার দিকে তাকাও বলছি।

—জী নেহি। কোনরকমে কথাটা বলেই সহসা রামঅধীন সিং কেঁদে উঠল ভেউ ভেউ করে। এসব স্বদেশীবাবুদের সে ভাল করেই জানে। সেবার মন্ত্রবলে জেলখানার মধ্যে বন্দুক এনে কি কাণ্ডটাই না করলে! ফিরে তাকালে এখনই যে তেমন কিছু করে বসবে না তা কে বলতে পারে। না বাবা, পৈত্রিক প্রাণটা এভাবে বেঘোরে হারাতে সে রাজী নয়।

কাণ্ড দেখে হা হা করে হেসে উঠলেন বীরেন। নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবনের প্রাণখোলা-হাসি। সে হাসিতে কোন খাদ নেই।

এবার এল পরবর্তী সাক্ষী হাইকোর্টের সেই অস্ত্রধারী বীর ধুরা সিং। বেশ বীরের মতই সে এল। হাইকোর্টকা আদমী কিনা।

—আমার দিকে তাকাও। একই নির্দেশ দিলেন বীরেন।

—নেহি। বিচারপতির চোখে চোখ রেখে বেশ বুকটান করেই জবাব দিল ধুরা সিং।

—তোমাকে আমার দিকে তাকাতেই হবে।

—কভি নেহি। ধুরা সিং অটল, অনড়। যাকে বলে ভদ্রলোকের এক কথা।

আসামীর দিকে তাকাও। এবার নিজেই নির্দেশ দিলেন বিচারপতি সুইনহো।

—জী! নিমেষে চুপসে গেল ধুরা সিং। সারা মুখ তার বিবর্ণ, রক্তশূন্য।

—আমি আদেশ করছি, তুমি আসামীর মুখের দিকে তাকাও।

—মর যায়েগা হুজুর।বালবাচ্চা লেকে একদম মর যায়েগা।

কাঁপতে কাঁপতে কোনরকমে কথাটা উচ্চারণ করেই হঠাৎ দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল ধুরা সিং। আর তার সাক্ষ্য নেওয়া কোনরকমেই সম্ভব হল না।

এবার মামলা স্থানান্তরিত হল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্সের আদালতে। উপযাচক হয়েই তিনি আইনজীবি নিশীথ সেনকে অনুরোধ জানালেন আসামীপক্ষের হয়ে মামলা পরিচালনা করার জন্য, কিন্তু বাদ সাধলেন বীরেন নিজেই। কি লাভ শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিয়ে। যা হবার সে তো হবেই।

অনুমান মিথ্যে হল না। সাজা হল প্রাণদণ্ড। সে আদেশ কার্যকরী হল ফেব্রুয়ারী মাসের ২১ তারিখে। সংখ্যায় আর একজন বাড়ল।

১০ই মার্চ, সোমবার। আজ আবার তোমাকে বলতে শুরু করেছি গতকালের সেই অসমাপ্ত কাহিনী।

চারু বসু এবং বীরেন দত্তগুপ্ত দুজনেই চলে গেলেন নিজের কর্তব্য শেষ করে।

তা বলে জলসা কিন্তু এখানেই শেষ হল না কল্যাণী। আবার একদিন আলিপুর জেলে জলসা বসল বিংশ শতাব্দীর দুই দশকে। সবার কণ্ঠে একই গান। বিশেষ করে দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায় দণ্ডিত বন্দীদের কণ্ঠে।

দক্ষিণেশ্বরে বোমার মামলা।

এ কাহিনী বুঝতে হলে একটু পিছিয়ে যেতে হবে কল্যাণী।

ঘটনার সূত্রপাত,—দক্ষিণেশ্বরের বাচস্পতি পাড়ার একটা জীর্ণ বাড়ীতে।

বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও আসলে ঐ বাড়ীটা ছিল পলাতক বিপ্লবীদের একটা গোপন আস্তানা।

প্রখ্যাত বিপ্লবী হরিনারায়ণ চন্দ, রাখাল দে, অনন্তহরি মিত্র, রাজেন লাহিড়ী, শিবরাম চট্টোপাধ্যায়, নিখিল ব্যানার্জী, দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী প্রমুখ অনেকেই তখন আশ্রয় নিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের সেই দোতালা বাড়ীটাতে।

কেউ চুপচাপ বসে নেই। ভেতরে চলেছে তখন মারাত্মক বোমা তৈরীর কাজ। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হলে উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র চাই। অনেক রকম অস্ত্রশস্ত্র।

কিন্তু টাকা! মাল মশলা কিনতে হলে অনেক টাকার প্রয়োজন। কোথায় পাওয়া যাবে এখন এত টাকা!

নিজের বসতবাড়ী বিক্রি করে এগারো হাজার টাকা এনে দিলেন ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী। এই নাও টাকা। এবার কাজ চালিয়ে যাও পুরোদমে।

প্রফুল্ল বসুও কম গেলেন না। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, তাদের বাড়ী ডাকাত পড়েছে। তারপর যা হবার তাই হল। দেখা গেল বাড়ীতে আর একটা অলঙ্কারও অবশিষ্ট নেই। সব ডাকাত নিয়ে গেছে।

ডাকাতই বটে। তাই একটু বাদেই আবার সেই অলঙ্কারগুলোকে দেখা গেল দক্ষিণেশ্বরের সেই দোতালা বাড়ীতে।

কে এনেছেন! এনেছেন প্রফুল্ল বসু নিজেই। স্বাধীনতার চাইতো অলঙ্কার বড় নয়। বোমা তৈরীর জন্ম আজ বিস্তর টাকার প্রয়োজন সুতরাং নিজের বাড়ীতে নিজেরই ডাকাতি না করে উপায় কি?

শুধু একটি ক্ষেত্রে নয় কল্যাণী। দেশের প্রয়োজনে সেদিন কত কত ছেলে মেয়ে যে এমনি ভাবে নিজের বাড়ীতে নিজেই ডাকাতি করেছিলেন, তার বোধহয় কোন গোণাগুনতি নেই।

প্রমোদ সেনগুপ্তও এনেছিলেন কিছু অলঙ্কার, তবু কোন স্থায়ী সুরাহা হল না, আরো টাকা চাই। অনেক টাকা! কোথায় পাওয়া যায় এখন এত টাকা।

'কিছু সরকারী ব্যবস্থা করলে হয় না?'

হ্যাঁ তাই। ওদের টাকা দিয়েই ওদের জন্য মারনাস্ত্র তৈরী করতে হবে। তা ছাড়া কোন উপায় নেই।

কাজেই তাই করা হল। সেদিন নবদ্বীপ পোষ্ট অফিস থেকে কৃষ্ণনগর পোষ্ট অফিসে বেশ কিছু টাকা যাচ্ছিল ঘোড়ার গাড়ী করে। বাধা পেল শিমূল তলার কাছাকাছি গিয়ে। আদেশ দিলেন তরুণ বিপ্লবী তারাদাস মুখার্জী,—'গাড়ী থামাও'।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চাবুক পড়ল শক্ত করে।

পালাও! পালাও! জোর্‌সে চলো এখান থেকে। আউর জোরসে। নইলে কিছুতেই আজ আর রক্ষা পাওয়া যাবেনা ওদের হাত থেকে।

গ্রাম! সঙ্গে সঙ্গে পায়ে বুলেটের আঘাত পেয়ে গারোয়ান লুটিয়ে পড়ল তার আসনের উপর। তারপর নিমেষেই সব টাকা উধাও।

দেখতে দেখতে হৈ চৈ পড়ে গেল চারিদিকে। স্বদেশী ডাকাত! স্বদেশী ডাকাত! কে কোথায় আছ, শীগগীর এসো।

এল পুলিস। এল সেপাই সান্ত্রী। তদন্তও এ নিয়ে কম হলনা। কিন্তু সব বৃথা। হাজার চেষ্টা করেও কোন সূত্র পাওয়া গেলনা কোন দিক থেকে।

তবু একটা ক্ষীণ সন্দেহ শাসকদের মনে জেগেই রইল সর্বক্ষণ। কে করতে পারে এমন কাজ! কার এত বড় সাহস!

নিশ্চয়ই অনন্তহরি মিত্র। সে ছাড়া এতবড় বুকের পাটা কারো হতে পারেনা। সুতরাং ধরো এবার অনন্তহরিকে।

কোথায় অনন্ত হরি! না, তার কোন চিহ্নও নেই। যেন হাওয়ায় মিশে গেছে ছেলেটা।

কোথায় যেতে পারে?

তন্ন তন্ন করে সর্বত্র খুঁজে দেখা হয়েছে, কিন্তু কোথাও তার কোন সন্ধান মেলেনি। তা হলে গেল কোথায়?

কলকাতায় যায়নি তো! নিশ্চয়ই তাই। সুতরাং খোঁজ কর এবার কলকাতায়। সর্বত্র খুঁজে দেখো। যে করে হোক, তাকে ধরা চাই-ই।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব! ক'জন লোক তাকে চেনে কলকাতায়! কলকাতা যে বিরাট শহর।

ঠিক আছে, নিয়ে এস ডাকসাইটে টিকটিকি নলিনীকান্ত রায়কে। অনন্তহরিকে সে বেশ ভালকরেই চেনে। তার পক্ষে হয়তো তাকে খুঁজে বের করাটা খুব একটা কষ্টকর হবে না।

কেটে গেল দিনের পর দিন, কিন্তু কোথায় অনন্তহরি! হাজার চেষ্টা করেও তার কোন সন্ধান পেলনা টিকটিকি নলিনীকান্ত রায়।

এমনি একদিনের কথা। তারিখটা ছিল ১৯২৫ সনের ৬ই নভেম্বর।

বেলা তখন প্রায় পৌনে ছুটো। শোভাবাজার ও চীৎপুর রোডের মোড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে নলিনীকান্ত রায়। মাথায় রাশি রাশি চিন্তার বোঝা।

ইতিমধ্যে বেশ কিছুদিন কেটে গেছে, কিন্তু কোথাও অনন্তহরির সন্ধান মেলেনি। কি করা যায় এখন! ওদিকে যে মণিবের কাছ থেকে ধমক খেয়ে খেয়ে প্রাণ একেবারে ঠাণ্ডা।

সহসা কি দেখে চোখ ছুটো সজাগ হয়ে উঠল নলিনীকান্ত রায়ের।

আরে! ট্যাক্সীতে কে গেল এইমাত্র! অনন্তহরি না!

হ্যাঁ, তাইতো। ইস! একেবারে নাকের উপর দিয়ে লোকটা চলে গেল, তবু কিছুই করা গেলনা। এমনকি ট্যাক্সীর নম্বরটা নিতে পর্যন্ত খেয়াল হলনা। এ দুঃখ যে কোনদিনই যাবার নয়।

কিন্তু একি! বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

আবার সেই ট্যাক্সীটা এদিকেই ফিরে আসছে যে। না, কোন ভুল নয়। ভেতরে অনন্তহরিই। তবে এবার তার সঙ্গে রয়েছে আরো দুজন। বীরেন্দ্র ব্যানার্জী আর ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী।

দেখতে দেখতে ট্যাক্সীটা উত্তর দিকে মিলিয়ে গেল একটু একটু করে। আর তাকে দেখা গেলনা।

তা যাক, তবে এবার নলিনীকান্ত রায় নিশ্চিন্ত। ট্যাক্সীর নম্বর নিতে এবার আর তার ভুল হয়নি। সুতরাং জাল ফেলে ডাঙায় টেনে তুলতে আর কতক্ষণ!

সেই রাত্রেই ট্যাক্সীওয়ালা হীরুর ডাক পড়ল পুলিস দপ্তরে। বল, ওরা কোথায় গিয়েছিল তোমার ট্যাক্সী করে? কোথায় নামিয়ে দিয়েছ ওদের?

—আজ্ঞে বরাহনগর বাজারে। ভয়ে ভয়ে জবাব দিল হীরু।

—তারপর কোথায় গেল ওরা?

—সেতো আমি বলতে পারবোনা হুজুর। তবে একটা ঠিকে ঘোড়ার গাড়ীতে আমি ওদের উঠতে দেখেছিলাম।

—গাড়ীটা দেখলে চিনতে পারবে?

—বোধহয় পারবো হুজুর।

—ঠিক আছে, কাল খুব ভোরে এখানে চলে আসবে। তোমাকে নিয়ে আমরা ঘটনাস্থলে যাবো। তুমি আমাদের সেই গাড়ীটাকে চিনিয়ে দেবে। মনে রেখো, কোনরকম চালাকী করলে বাঁচতে পারবেনা।

পরদিন বরাহনগর বাজারে। কোথায় সেই ঠিকে গাড়ীওয়ালা, দেখাও।

—এই যে হুজুর। একটা গাড়ী দেখিয়ে জবাব দিল হীরু, এই গাড়ীতেই ওরা সবাই উঠেছিল।

এবার চেপে ধরা হল সেই ঘোড়ার গাড়ীর গারোয়ানকে। কোথায় ওরা গিয়েছিল তোমার গাড়ীতে করে? সব কথা খুলে বল। নইলে বিপদ হবে।

—একটা পুকুর পারে গিয়ে ওরা নেমে গিয়েছিল হুজুর। জবাব দিল গারোয়ান।

—জায়গাটা দেখাতে পারবে?

—পারবো হুজুর।

—ঠিক আছে, চলো। তবে সাবধান। কাকপক্ষীও যেন টের না পায়। কোন কথা একান ওকান করেছ কি, দশবছরের সাজা, তা যেন মনে থাকে। নাও, চলো এবার। দূর থেকে জায়গাটা দেখিয়ে দেবে।

অপর পক্ষও চুপচাপ বসে ছিলনা। তোড় জোড় চলছিল দিন কয়েক আগে থেকেই।

জায়গাটা নিরাপদ নয়। আর এখানে থাকাটা ঠিক হবে না। অবিলম্বে সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে তন্যত্র সরে যাওয়া দরকার।

৯ই তারিখে চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী নৌকো নিয়ে এসে হাজির। চল এবার সবাই গঙ্গার ওপারে। আর একদিনও এখানে নয়।

কিন্তু সব বৃথা। মোট ন'জনের মধ্যে পাঁচজনই সেদিন জ্বরে অচৈতন্য। বাকী সবাই তাদের নিয়েই ব্যস্ত। এ অবস্থায় নড়াচড়া করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বাধ্য হয়েই সে রাত্রিটা পাশের বাড়ীতে ঠাঁই নিলেন চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী। ওখানে স্থানাভাব। সুতরাং এ ছাড়া কোন উপায় নেই।

পূব আকাশে রঙ ধরেছে। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে একটু একটু করে।

হঠাৎ একটা বাড়ীর সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল—খট্‌খট্—খট্‌খট্—খট্‌খট্…

কে! ঘুম জড়িত কণ্ঠে কে একজন সাড়া দিল ভেতর থেকে।

—দরজাটা খুলুন একবার। দরকার আছে।

দরজা খুলেই গৃহস্বামী অবাক। সামনেই দাঁড়িয়ে চব্বিশ পরগণার এডিসন্যাল পুলিস সুপার মিঃ ডাকৃফিল্ড। সঙ্গে বিরাট এক পুলিস বাহিনী।

—আমরা আপনার বাড়ী সার্চ করবো। এ বাড়ীতে টেরোরিষ্টরা আশ্রয় নিয়েছে।

—বেশ, সার্চ করুন। তবে আপনি ভুল করেছেন। টেরোরিষ্ট তো দূরের কথা, এ বাড়ীতে একমাত্র আমি ছাড়া আর কোন পুরুষই নেই।

ডাকৃফিল্ড অবাক। সত্যিই তাই। আর কোন পুরুষই নেই এ বাড়ীতে। তাহলে গেল কোথায় ওরা!

—কাদের কথা বলছেন?

—জনকয়েক বাঙ্গালী ছেলে। এখানেই কোথাও তারা রয়েছে। একেবারে পাকা খবর।

—তাহলে পুকুরের ওপারে ঐ দোতালা বাড়ীটাতে একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন। ওখানে কয়েকটি অচেনা ছেলে বাস করে বলে জানি। পরিচয় জানিনে, কারণ কারো সঙ্গে মেলামেশা করতে তারা খুব একটা অভ্যস্থ নয়।

এবার আর ভুল হল না। একটু বাদেই বাচস্পতি পাড়ার সেই দোতালা বাড়ীটার নীচে কড়া নড়ার শব্দ হল—খট্‌খট্—খট্‌খট্—খট্‌খট্….

কান খাড়া হয়ে উঠল ভেতরে অবস্থানকারী বিপ্লবী তরুণ রাখাল দের। নিশ্চয়ই গয়লা। তা ছাড়া আর কে কড়া নাড়তে আসবে এই সাতসকালে।

দরজা খুলতে না খুলতেই হুড়মুড় করে সবাই ঢুকে পড়ল বাড়ীর মধ্যে। হ্যাণ্ডস্ আপ। একটু নড়েছ কি, মরেছ।

সিপাই, হ্যাণ্ড কাপ লাগাও।

বাধা দেবার মত কোন রকম অবকাশই পেলেন না রাখাল দে। তা ছাড়া উপস্থিত ন'জনের মধ্যে পাঁচজনই গুরুতর অসুস্থ। এ অবস্থায় কোন রকম ঝুঁকি নেওয়া সম্ভবও নয়।

একতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে দোতালায়।

কিন্তু ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। শক্ত মজবুদ দরজা। কি করা যায় এখন!

ঠিক আছে, পাশের বাড়ী থেকে একটা কুড়োল চেয়ে নিয়ে এসো। চট্‌পট্ যাও। দেরী করোনা যেন।

কুড়োলের ঘায়ে দেখতে দেখতেই একসময়ে কাঠের দরজা ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। এবার! এবার যাবে কোথায় তোমরা!

প্রথমেই ধরা পড়লেন রাজেন লাহিড়ী। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার ফেরারী আসামী সেই রাজেন লাহেড়ী।

মাঝের ঘরে ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী ও শিবরাম চ্যাটার্জী জ্বরে অচৈতন্য। শিয়রে শুশ্রূষারত সেই অনন্তহরি। সবাইকে গ্রেপ্তার করা হল একে একে।

বারান্দায় ধরা হল দেবীপ্রসাদ চ্যাটার্জীকে।

পূবদিকের ঘরে হরিনারায়ণ চন্দ, বীরেন্দ্রকুমার ব্যানার্জী আর নিখিল ব্যানার্জী। কারোরই তখন জ্ঞান নেই। সুতরাং বাধা দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

একমাত্র বেঁচে গেলেন রাত্রে পাশের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণকারী সেই চৈতন্যদেব চ্যাটার্জী।

পরিস্থিতি লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে গেলেন শোভা-বাজারের দিকে। ওখানেও একটি ঘাঁটি রয়েছে পলাতক বিপ্লবীদের জন্য। এখানে যখন পুলিসী হামলা শুরু হয়েছে, তখন ওখানেও

এমনি কিছু একটা ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। সুতরাং আগে থাকতেই তাদের সাবধান করে দেওয়া দরকার।

খট্‌খট্‌-খট্‌খট্‌-খট্‌খট্‌……

চমকে উঠলেন চার নম্বর শোভাবাজার ষ্ট্রীটের বাড়ীতে অবস্থানকারী পলাতক বিপ্লবী প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী আর অনন্তকুমার চক্রবর্তী।

কে এল! কে দরজায় কড়া নাড়ে এই সাতসকালে!

পুলিস! পুলিস! পুলিস!

দেখেই তাড়াতাড়ি সবলে দরজা চেপে ধরলেন প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী। না, এত শীগগীর ধরা দিলে চলবে না।

আগে ঐ মেঝেতে উপবিষ্ট শান্ত, সমাহিত মানুষটির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, তারপর অন্য কথা।

—আপনি পালান। চাপা গলায় বললেন প্রমোদরঞ্জন, পেছনের ঐ গরাদহীন জানালাটা দিয়ে গলিয়ে গিয়ে সোজা পাইপ বেয়ে নীচে নেমে যান। দেরী করবেন না।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ফিরে তাকালেন মানুষটি। চোখে মুখে নির্বিকার ঔদাসীন্য। শিয়রে শমন এসে হানা দিয়েছে, তবু তিনি তেমনি শান্ত। তেমনিই সমাহিত।

আপনি যান। কাতরতা ঝরে পড়ল প্রমোদরঞ্জনের কণ্ঠে, আমাদের যা হবার হবে, কিন্তু আপনার যে এসময়ে বাইরে থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। সারা দেশ আজ তাকিয়ে আছে আপনার দিকে। আপনাকে ধরা দিলে চলবে কেন! আর দেরী করবেন না। এক্ষুনি নীচে নেমে যান পাইপ বেয়ে। আমি ততক্ষণ ওদের মহড়া নিচ্ছি।

আস্তে আস্তে মানুষটি এবার এগিয়ে গেল জানালার কাছে। তারপরই এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে গেল একটু একটু করে।

বিরাট পুলিস বাহিনীর বিরুদ্ধে একক শক্তি আর কতক্ষণ! ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিস বাহিনী ভেতরে ঢুকে পড়ল সদল বলে! পাকড়ো! ধরো এবার সবাইকে।

প্রমোদরঞ্জন তখনো মরীয়া। শুরু হল প্রবল ধ্বস্তাধ্বস্তি। ঐ শান্তশিষ্ট নিবিরোধী মানুষটিকে নীচে নেমে পালাবার সুযোগ দিতে হবে। সুতরাং ধ্বস্তাধ্বস্তি করে যতক্ষণ সম্ভব, পুলিস বাহিনীকে এদিকে আটকে রাখতে হবে।

প্রমোদরঞ্জনের সেই প্রচেষ্টা কিন্তু সেদিন ব্যর্থ হয়নি কল্যাণী। সত্যিই পুলিস সেদিন ধরতে সক্ষম হয়নি সেই শান্তশিষ্ট নির্বিরোধী মানুষটিকে।

মানুষটি কে জানো কল্যাণী! শুনে চমকে উঠোনা যেন।

নাম তাঁর সূর্য্য সেন। চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক মহা-বিপ্লবী মাষ্টারদা সূর্য্য সেন।

কল্যাণী, এ কাহিনী লিখতে গিয়ে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আজ একটি কথাই বেরিয়ে আসছে বার বার—ধন্য প্রমোদরঞ্জন, সত্যই তুমি ধন্য।

নিজের উপর সব কিছু ঝুঁকি নিয়ে সেদিন তিনি যদি মাষ্টারদাকে অমন করে না সরিয়ে দিতেন, তাহলে ১৯৩০ সনে তাঁর অধিনায়কত্বে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হতো কি কল্যাণী! সংসারে এ মহত্বের তুলনা কোথায় বলো?

তারপর একদিন শুরু হল মামলা। দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা। আসামী মোট এগারোজন।

ঘটনাস্থলে বোমা তৈরীর সাজ-সরঞ্জাম ও আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়া গেছে, সুতরাং লঘুদণ্ডের কোন প্রশ্নই ওঠেনা। তাই শেষ পর্য্যন্ত হরিনারায়ণ চন্দ, রাজেন লাহিড়ী ও অনন্তহরিকে দেওয়া হলো দশবছর কারাদণ্ড। বাকী সবাইকেও সাজা দেওয়া হল বিভিন্ন মেয়াদে।

রাজেন লাহিড়ীকে সঙ্গে সঙ্গেই আবার পাঠিয়ে দেওয়া হল উত্তর

প্রদেশে। কারণ কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার তিনি একজন পলাতক আসামী। সুতরাং তাকে আর একদফা সাজা নিতে হবে বৈকি।

সে মামলায় রামপ্রসাদ বিসমিল, ঠাকুর রোশন সিং, আসফাকুউল্লা ও রাজেন লাহিড়ীকে যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল, সে কথাতো তোমাকে আগেই বলেছি।

এই হল দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা।

এই বোমার মামলায় দণ্ডিত বন্দীরাই সেদিন বিশেষ একটি মানুষের দেখা পেলে সঙ্গে সঙ্গে গান ধরতেন :

'তোমায় নেয়না কেন যম
এত লোকের গরু মরে
তোমার বেলায় একি ভ্রম!
শীতলার বাহন তুমি
ধোপার প্রিয় ধন—
তোমায় নেয়না কেন যম?'

ধোপার প্রিয় ধনটি হল আই. বি. বিভাগের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা রায় বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জী।

বন্দীরা আদর করে ডাকতেন— 'মামা'।

দেখাদেখি অন্যান্য সাধারণ কয়েদী, জেলার, জেল-সুপার— সবাই তাকে ডাকতেন মামা। যাকে বলে 'সরকারী মামা'।

মামা কিন্তু এতটুকুও অসন্তুষ্ট হতেন না সবার মুখে এই সম্বোধনটি শুনে। আহা, বলুক। হাজার হোক ছেলেমানুষ। বলুক না যত খুশী।

যাকে বলে পাকা অভিনেতা। বিশেষ করে পেটের কথা টেনে বের করতে সত্যিই তার জুড়ি ছিল না।

জেলে গিয়ে প্রায়ই তিনি অল্পবয়স্ক বন্দীদের এক এক করে

ডাকিয়ে আনতেন নিজের কামরায়। তারপরই শুরু হতো তার অভিনয়ের মহলা।

যা হবার হয়ে গেছে, তা বলে রিভলবারের কথাটা যেন কোর্টে স্বীকার করতে যেয়ো না। নেহাত পরের গোলামী করি, তাই মুখে স্বীকার করতে পারিনে। নইলে দেশ স্বাধীন হোক, আমিই কি তা চাইনে।

মুহূর্ত বাদেই আবার পট পরিবর্তন। মুখটা এমন শুকনো দেখাচ্ছে কেন ভাই? খিদে পেয়েছে বুঝি? দাঁড়াও, খাবার আনিয়ে দিচ্ছি।

না না, লজ্জার কোন কারণ নেই। আমিও বাঙালী। তোমরা দেশের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করবে, আর আমি কি এটুকু করতে পারব না তোমাদের জন্য?

যাক, রিভলবারের কথাটা খেয়াল রেখো। কিছুতেই যেন স্বীকার করো না কোর্টে। মনে থাকবে তো?

অদ্ভুত করিৎকর্মা লোক। বহুক্ষেত্রেই তিনি কৃতকার্য হয়েছেন এমনি করে। এত বিচক্ষণতার সঙ্গে আস্তে আস্তে জাল ছড়াতেন যে হাজার চেষ্টা করেও সে জালকে এড়িয়ে, পাশ কাটিয়ে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব হতো না।

ওদিকে মামার নামের পাশে ততদিনে লাল ঢেড়া পড়ে গেছে ভেতরে ভেতরে। এই করে অনেক ক্ষতি করেছে লোকটা। আরও কত ক্ষতি করবে কে জানে। সুতরাং ওকে স্তব্ধ করা দরকার।

বাইরে যাবার উপায় নেই। করতে হবে জেলের ভেতরেই। কিন্তু কি করে তা সম্ভব। জেলের ভেতরে অস্ত্র পাওয়া যাবে কি করে?

কানাই সত্যেনের যুগ অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখনকার পুলিস অনেক বেশী সতর্ক। তাদের নজর এড়িয়ে বাইরে থেকে রিভলবার আনা সোজা কথা নয়।

কি দরকার রিভলবারের ! ঐ তো ওখানে একটা শাবল পড়ে রয়েছে। বোধহয় সাধারণ কয়েদীরা কাজ করতে করতে ভুল করে ওটা ওখানে ফেলে গেছে। তেমন কায়দামত চালাতে পারলে ওটাই বা মন্দ কি ! দেখাই যাক না।

দেখা গেল ১৯২৬ সনের ২৮শে মে।

সেদিন মামাকে দেখেই দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার বন্দী সুধাংশু চৌধুরী গান ধরলেন :

'তোমায় নেয় না কেন যম,
এত লোকের গরু মরে
তোমার বেলায় এ কি ভ্রম !
শীতলার বাহন তুমি
ধোপার প্রিয় ধন।'

গান শুনে মামা হাসতে লাগলেন মিটিমিটি। আহা, বলুক। হাজার হোক ছেলেমানুষ। বলে যদি শান্তি পায় তো যত খুশী বলুক।

কাছে দাঁড়িয়ে বিশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত খুনী আসামী মতি। আর খানিক দূরে দুজন ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডার মিঃ ক্রুমফিল্ড ও মিঃ লাভরি। মামার বন্দনা-গান শুনে তারাও হাসতে লাগলেন বেশ প্রাণ খুলেই। যেন এ একটা মজার ব্যাপার আর কি !

ধোপার প্রিয় ধনটিকে কোলে তুলে নিতে সেদিন আর কিন্তু এতটুকুও ভুল হল না যমরাজের।

পরিকল্পনা মত প্রথমেই এগিয়ে এলেন নিখিল ব্যানার্জী। দরজা খোল সিপাইজী। হাওয়া লেগে আমার কাপড়টা বাইরে পড়ে গেছে। ঐ দেখোনা।

তাকিয়ে দেখল সিপাইজী। সত্যিই তাই। ঠিক আছে, দরজা খুলে দিচ্ছি। চট করে তুলে নিয়ে আসুন ওটা।

—নমস্কার মামা। মামাকে দেখেই হাত তুলে নমস্কার জানালেন নিখিল ব্যানার্জী।

—হ্যাঁ, নমস্কার। মামার সারামুখে শিশুর সারল্য, তা শরীর-টরীর ভাল তো! কিছু দরকার হলে আমাকে—

সহসা বিরাট এক ঘুসি খেয়ে মামার মাথাটা ঘুরে উঠল বনবন করে। মুহূর্তমাত্র, সঙ্গে সঙ্গেই প্রমোদ চৌধুরী পেছন থেকে শাবলের এক প্রচণ্ড আঘাতে মামার মাথাটাকে দিলেন চূর্ণবিচূর্ণ করে।

শাবলটার ওজন কত ছিল জানো কল্যাণী! পনেরো সের। ওই দিয়ে একটি মাত্র ঘা। ফলে মাথা তো গেলই, অধিকন্তু একটা চোখ যে কোথায় ছিটকে বেরিয়ে গেল, তার আর কোন হদিসই পাওয়া গেলনা।

ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং!

জেলের পাগলা ঘন্টি একটানা বেজে চলল বহুক্ষণ ধরে।

ছুটে এল সেপাই-শান্ত্রীর দল। ছুটে এল জেলর, ডেপুটি-জেলর, জমাদার, মেট্রন, ওয়ার্ডার ইত্যাদি সবাই।

কিন্তু সরকারী মামা ভূপেন চ্যাটার্জী তখন কোথায়! তার আগেই সব শেষ।

আবার মামলা শুরু হল নতুন করে।

আসামী অনন্তহরি মিত্র, প্রমোদ চৌধুরী, রাখাল দে, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জী, অনন্ত চক্রবর্তী এবং আরো পাঁচ জন। অপরাধ,—জেলের অভ্যন্তরে ইচ্ছাকৃত নরহত্যা।

কিন্তু সাক্ষী! সাক্ষী কোথায় তোমাদের?

না, খুনী আসামী মতি কিছুতেই স্বদেশী বাবুদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে রাজী নয়। কত প্রলোভন, কত ভীতি-প্রদর্শন, তবুও নয়।

স্বদেশী বাবুদের জাতই আলাদা। কত ফাঁসি, কত নির্যাতন, কত দ্বীপান্তর, তবু নিজের সঙ্কল্পে তারা স্থির, অবিচল। একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন বন্দীজীবনে ঐ স্বদেশী বাবুদের একটু সেবা করার সুযোগ

পেয়ে জীবন তার ধন্য হয়ে গেছে। সেই গৌরবটুকু হাজার প্রলোভনেও সে হারাতে রাজী নয়।

মতি! বিশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত খুনী আসামী মতি। নামটা তুমি মনে রেখো কল্যাণী। কারণ এ কাহিনীতে আবার তুমি তার দেখা পাবে যথাসময়ে।

ইতিমধ্যে কত যুগ কেটে গেছে। তবু সেদিনের সেই বিপ্লবীদের মধ্যে আজো বোধহয় কেউ ভুলতে পারেনি তাদের দুঃসহ বন্দীজীবনের সেই পরম বন্ধু, খুনী আসামী মতির কথা। অস্পষ্ট হলেও সে স্মৃতি আজও অবিস্মরণীয়।

আশ্চর্য, শ্বেতাঙ্গ ওয়ার্ডার ক্রমফিল্ড বা লাভরিও রাজী হলেন না এ মামলায় কোনরকম সাক্ষ্য দিতে। ওরা টেররিস্ট নয়, দেশপ্রেমী বিপ্লবী। ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে নিজের মনুষ্যত্বকে অবমাননা করতে তারা রাজী নন।

তা বলে সাক্ষীর অভাব হল না। সময়টা বিকেল। ঘটনার আগেই জেনারেল লক-আপ হয়ে গেছে। কয়েদীদের মধ্যে কারো সে সময়ে বাইরে থাকার কথা নয়।

তবু দণ্ডাদেশ থেকে মুক্তি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের মধ্য থেকেই কয়েকজনকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে হাজির করা হল সাক্ষীর কাঠগড়ায়। নাও, যা-যা দেখেছ, সব কথা খুলে বল হুজুরের কাছে।

সব কথাই তারা খুলে বলল হলপ করে। কোথাও এতটুকু ভুল হল না। তারা নাকি প্রত্যক্ষদর্শী। নিজের চোখেই নাকি তারা সব দেখেছে।

ফলে রায় যা দেওয়া হল, তা বোধহয় কাজীর বিচারকেও হার মানায়। অনন্তহরি, বীরেন্দ্র ব্যানার্জী ও সেই প্রমোদ চৌধুরীকে দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। আর রাখাল দে, ক্রবেশ চক্রবর্তী ও অনন্ত চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

আরো মজা হল হাইকোর্টে। সেখানে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বন্দী বীরেন্দ্র ব্যানার্জী বেকসুর খালাস। হরিনারায়ণ চন্দ্র ও নিখিল ব্যানার্জীও খালাস। অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের যা ছিল—তাই। অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড।

৯ই আগষ্ট। ১৯২৬ সন। ভোর পাঁচটা।

বধ্য-মঞ্চের দিকে যেতে যেতে সে কি উল্লাস সেদিন অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের।

তারপরই শুরু হল তীব্র প্রতিযোগিতা। কে আগে গলায় ফাঁসির রজ্জু ধারণ করবে দুজনের মধ্যে! আমি আগে যাব! উঁহু, তা হবে না। আমি বয়োজ্যেষ্ঠ, সুতরাং আমাকে সে সম্মান তোমার দিত্যেই হবে।

শত শত রাজনৈতিক ও সাধারণ কয়েদীর কণ্ঠে তখন একটানা মাতৃ-বন্দনার সুর বেজে চলেছে, বন্দেমাতরম্! শহীদ অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরী—জিন্দাবাদ! বিপ্লব দীর্ঘজীবি হোক।

এবার শোন বিভিন্ন জেলে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের গানের কথা।

তবে এ গান সে গান নয় কল্যাণী, আসলে এটা হল নিজের সঙ্গে মর্মান্তিক এক বেদনামধুর লুকোচুরীর কাহিনী।

বাংলার যৌবন সেদিন কারারুদ্ধ। হাজার হাজার ছেলে মেয়ে কারাগারে বন্দী। কেউ বিচারের প্রহসনে, কেউ বা বিনা বিচারে।

এমনি করে দিনের পর দিন। বছরের পর বছর।

বন্দী জীবন। সে জীবনে না আছে কোন বৈচিত্র্য, না কোন নতুনত্ব।

একই রঙ নিয়ে সেখানে দেখা দেয় ভোরের সূর্য্য, স্তব্ধ দুপুর আর শান্ত বিকেল। দিন আর রাত্রির সেখানে একই চেহারা।

তবু দিনের বেলাটা কর্ম কোলাহলের মধ্য দিয়ে কোনরকমে কেটে যায়, কিন্তু বিপদ হয় রাত্রে। কত কথা তখন ভীড় করে আসে চিন্তার আবর্তে। টুকরো টুকরো কত কাহিনী।

মনে পড়ে পুরনো জীবনের ছন্দ। পুরনো মানুষের কথা।

মনে পড়ে বহু দূরে অবস্থানকারী বাবা-মার কথা। মা হয়তো কত ভাবছেন। অনির্বান প্রদীপ শিখার মত বিনিদ্র আঁখি দুটি মেলে এখনো হয় তো তিনি তাকিয়ে আছেন তার ফিরে যাবার পথ চেয়ে। কবে তাঁর সে আশা পূর্ণ হবে কে জানে! হবে কি কোনদিন!

মনে পড়ে ছোট ছোট ভাই বোনগুলোর কথা। কেমন আছে ওরা এখন! হয়তো খুব বড় হয়ে উঠেছে এরি মধ্যেই। ফিরে গেলে সহসা ওরা ওদের দাদাকে চট্ করে চিনতে পারবে কি!

ভাবনার পর ভাবনা। অস্থির চঞ্চল সব ভাবনা।

তা বলে মুখে কিন্তু সে কথা স্বীকার করতে রাজী নয়। তারই বহিঃপ্রকাশ হল এই গানের অভিনয়। ভাবটা এই যে,— না, আমরা বেশ আছি। কোন দুঃখ নেই আমাদের মনে। দেখছোনা কেমন মনের আনন্দে গান গাইছি আমরা!

এই গানের প্রসঙ্গে তখনকার সময়ের বক্সা ও দেউলী ক্যাম্পে আটক বন্দী প্রবীন বিপ্লবী শ্রদ্ধেয় নিকুঞ্জ সেন তার সম্প্রতি প্রকাশিত বিখ্যাত 'বকসার পরে দেউলী' গ্রন্থে কি লিখেছেন শোন:

'দেউলী জেলে, আর শুধু দেউলী জেলেই বলি কেন, সব জেলেই বন্দীদের প্রধান এবং প্রকৃষ্টতম প্রকাশের ক্ষেত্র হইতেছে গানের রাজ্য।

এ রাজ্যের একটা সুবিধা ছিল এই যে, ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন সকলেই, এ-বিদ্যা যাঁহার আয়ত্তে আছে তিনিও; যাঁহার একেবারে কিছু নাই তিনিও।

সত্য কথা বলিতে কি, গায়ক আমরা সকলেই, কাহারও গান প্রকাশ যোগ্য, আবার কাহারও গান 'সারা জনমের তরে' মনের অভ্যন্তরে চির-নির্বাসিত।

কিন্তু, তাঁহা সত্বেও আমরা যে প্রত্যেকেই আমাদের নিজেদের কাছে এক-একজন গায়ক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

সে গান কেহ কোন দিন শোনে নাই, কোন দিন কেহ হয়তো শুনিবেও না, কিন্তু, তবু কত দীর্ঘ দিন, কত দীর্ঘ রাত্রি যে নির্জন কারাবাসে দুদিনের চির-সাথী এই অশ্রুত-সঙ্গীত, বন্দী জীবনের শুষ্ক, নীরস, নিষ্ঠুর দিনগুলিকে রস-ঘন করিয়া তুলিয়াছে, বন্দী বন্ধুদের তো আর সে কথা অজানা নাই।

জীবনবাবু (শ্রীযুক্ত জীবন সরকার) সেই জন্যই দুঃখ করিয়া বলিতেন, 'সঙ্গীতজ্ঞদের গানের আসরে আমরা জায়গা পাই না, কিন্তু ওঁরা কি জানেন যে, ঐ আসরের শ্রেষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ মিলে সারা জীবনে যত গান গেয়েছেন, আমি একাই তত গান গেয়েছি।'

কথাটা জীবনবাবু মিথ্যা বলেন নাই। গান যখন তাঁহাকে পাইয়া বসিত, তখন চলিতে-ফিরিতে, শুইতে-বসিতে সর্বক্ষণই তিনি গানের সুর ভাঁজিতেন।

গান সম্পর্কে জীবনবাবু ছিলেন স্বাতন্ত্র-ধর্মী। বাধাধরা কোন সুর কিংবা কোন তাল-লয়ের Convention তিনি মানিয়া চলিতেন না। সুরও যেমন ছিল তাঁহার নিজস্ব, গানের পদ্ধতিটিও ছিল তাঁহার স্বতন্ত্র।

তাহা ছাড়া অদ্ভুত ছিল তাঁহার ধৈর্য্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গাহিয়া চলিয়াছেন, বন্ধু-বান্ধবেরা সে গান শুনিয়া দূরে পালাইয়া যাইতেছে, কেহ বা কাছে আসিয়া তাঁহাকে থামাইতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সাধ্য কি যে জীবনবাবুর সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটায়।

একের পর এক গান তিনি গাহিয়াই চলিয়াছেন। সর্বাঙ্গে অবিরত ধারায় ঘাম ঝরিতেছে, ঘন ঘন নিশ্বাসে বক্ষ তাঁহার

উঠানামা করিতেছে, কণ্ঠের নালীগুলি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তবু জীবনবাবুর ভ্রূক্ষেপ নাই, অবিশ্রান্ত গতিতে গান তাঁহার চলিতেছে।

গানের কথা সম্পর্কেও সংস্কারমুক্ত ছিলেন তিনি। তাই দেখিয়াছি, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' হইতে সুরু করিয়া 'অস্তি গোদাবরী তীরে বিশাল শাল্মলী তরু' পর্য্যন্ত যে-কোন পদকেই তাঁহার নিজস্ব সঙ্গীতাবর্তে ফেলিয়া জীবনবাবু তাঁহার অভিনব পদ্ধতিতে অনর্গল গান গাহিয়া যাইতেন!

সুরের কোন বালাই ছিল না, 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' আর 'অস্তি গোদাবরী তীরে' প্রভৃতি যাবতীয় গানের কথা জীবনবাবুর কণ্ঠে একই সুরের রেশে উচ্ছল হইয়া উঠিত।

জীবনবাবুর আর একটি অভ্যাস ছিল। সেটা আরো মারাত্মক।

মাঝে মাঝে 'সঞ্চয়িতা' 'চয়নিকা' 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রভৃতি গাহিতেন। দেউলীর ঐ গ্রীষ্মতাপ দগ্ধ দ্বিপ্রহরেই জীবনবাবুর হয়তো একদিন গানের ঝোঁক চাপিয়া বসিল। আর কথা নাই, অমনি তিনি সুর ভাঁজিতে সুরু করিলেন।

বন্ধুরা বুঝিলেন, আর রক্ষা নাই, জীবনবাবুর ঘাড়ে এবার গানের ভূত চাপিয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গেই জীবনবাবুর উচ্চ কণ্ঠ গর্জন করিয়া উঠিল, প্রথমে সাবধান বাণী উচ্চারিত হইল। জীবনবাবু ঘোষণা করিলেন—'আজ আমার সঞ্চয়িতা গান।'

প্রাণটা সকলেরই কাঁপিয়া উঠিল। কেহ-কেহ বলিল, 'জীবন-বাবু এখন থাক, সন্ধ্যার পর গানটা জমবে ভাল।'

কিন্তু কে কার কথা শোনে? যে সুর ভিতর হইতেই ঠেলিয়া বাহির হইতেছে তাহাকে রোধ করিবে কে? একটি একটি করিয়া 'সঞ্চয়িতা'-র প্রতিটি কবিতাকে নিজস্ব ঢঙে গাহিয়া তবে তিনি ছাড়িতেন। এমনি ছিল সঙ্গীতে তাহার উৎসাহ। তাই তিনি

যখন বলিতেন যে, 'ওরা আমাকে গানের আসরে ঢুকতে দেয় না,' তখন কথাটা যে কত দুঃখে বলিতেন তাহা অতি সহজেই অনুমান করা যায়।

জীবনবাবুর গান সম্পর্কে নানা কাহিনী নানা ভাবেই প্রচারিত হইয়াছিল। এসব প্রচার কার্য সম্পর্কে ফণীবাবু বলিয়াছেন যে, ইহাদের অধিকাংশই নাকি অতিরঞ্জিত, তবে একটা গল্প যে তাঁহার সম্পর্কে শোনা যায় তাহা গল্প হইলেও নাকি সত্য। ঘটনাটি ঘটিয়াছিল, বাংলা দেশেরই একটি জেলে।

জীবনবাবুর তখন বন্দী-দশা সবে আরম্ভ। পুলিসের হেফাজতে বহু কিছু খাইয়া এবং না খাইয়া তিনি সবেমাত্র জেলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। মনটা তাঁহার প্রফুল্লই ছিল বলিতে হইবে। হউক না জেল, তবু তো পুলিসের হাত হইতে চিরতরে মুক্তি।

সাধারণ দুই-একজন কয়েদি ছাড়া জীবনবাবুর আর কোন সাথী ছিল না, সুতরাং তাঁহার সঙ্গীত ছিল এই নির্জন কারাবাসের একমাত্র সঙ্গী। এই সঙ্গীকে লইয়াই জীবনবাবু একদিন মহাবিপদে পড়িয়া গিয়াছিলেন।

গরমের দিন। রাত্রি প্রায় শেষ হইতে চলিল, কিন্তু জীবনবাবুর আর কিছুতেই সারারাত্রি ঘুম হইল না। একবার শয্যায় গড়াগড়ি করিতেছেন, একবার ক্ষুদ্র কক্ষে পায়চারি করিতেছেন, কিন্তু, সবই বৃথা, ঘুম কিছুতেই আসিতেছে না। অনন্যোপায় হইলে সকল বন্দীরাই যাহা করেন, জীবনবাবুও তাহাই করিলেন; তিনি গান ধরিলেন—'চয়নিকা' গান।

নিঝুম—নিস্তব্ধ রাত।

চারিদিকে কোন সাড়া শব্দ নাই। সেই স্তব্ধতা ভেদ করিয়া নৈঃশব্দের অতল তল হইতে জীবনবাবুর জলদগম্ভীর কণ্ঠ গর্জন করিয়া উঠিল।

"ভাঙরে হৃদয়-ভাঙরে বাঁধন,
সাধরে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পর লহরী তুলিয়া
আঘাতের পর আঘাত কর,—"

জীবনবাবুর রুদ্ধ কক্ষের প্রতিটি ইট, জেল প্রাচীরের প্রতিটি প্রস্তর খণ্ড, সমগ্র জেলের পরিবেশ যেন একই সঙ্গে জীবনবাবুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল "আঘাতের পর আঘাত কর"—

আঘাত অবশ্য আর করিতে হইল না। জেল-সান্ত্রীর একাধিক বাঁশি সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া উঠিল, জেল-গেটে পাগলা ঘন্টির আওয়াজ শোনা গেল। মুহূর্তের মধ্যে জেলের নৈশ স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সশস্ত্র সান্ত্রীর দল পাগলের মত ছুটিল জীবনবাবুর কক্ষের দিকে।

এত যে কাণ্ড ইহার মধ্যে হইয়া গিয়াছে, সেদিকে জীবনবাবুর ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি তখনও চক্ষু বুজিয়া গাহিতেছেন, 'আঘাতের পর আঘাত কর,—'

সান্ত্রীরা তো জীবনবাবুর কক্ষে আসিয়া একেবারে থ' খাইয়া গেল। কে একজন বলিল, 'কুঁছ নেহি হুয়া ভাই, বাবু তো গানা গা রহে হেঁ।'

সান্ত্রীরা হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। ঐ জেলে জীবনবাবু বাকি যে ক-দিন ছিলেন রাত্রিতে নাকি আর কোন দিন গান গাহেন নাই।

ইহার পরে ফণীবাবুকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত যে, 'জীবন-বাবু তো গান গাহেন না, তিনি 'গান' দাগেন!' জীবনবাবু কিন্তু এ সব কথায় বিন্দুমাত্রও দমিতেন না।···

এমনি ভাবে দিন যাইতে লাগিল। গান হয়তো কোন কোন সময় থামিত,—কিন্তু গানের ঢেউ? তাহাকে থামায় সাধ্য কার?

সে ঢেউ যে কত জায়গায় কত বেরসিকদের শুষ্ক মনে সাড়া জাগাইয়াছে তাহা আজ মনেও নাই, কিন্তু একটি কথা মনে আছে যে সেদিন উচ্চকণ্ঠেই হউক আর গুনগুন করিয়াই হউক, প্রকাশ্যেই

হউক আর গোপনেই হউক, গান গাহিতেন না ; এমন কেউ হয়তো দেউলীতে ছিলেন না।

একটি দিনের কথা বলি। ভোর বেলা কিচেনের সামনে চায়ের আসর বসিয়াছে। গল্প-গুজব, আলাপ-আলোচনা, হাসি-তামাসায় আসরটি বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় হন্তদন্ত হইয়া শ্রীযুক্ত ফণী চ্যাটার্জী মহাশয় আসিয়া হাজির।

হৈ-হল্লা থামিয়া গেল। ফণীবাবুর চেহারা দেখিয়া অনেকেরহ মনে হইল যে, নিশ্চয়ই কোন দুঃসংবাদ তিনি বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাই সকলে প্রায় সমস্বরে প্রশ্ন করিলেন, 'ব্যাপার কি ফণীবাবু—কি হয়েছে?'

গম্ভীর মুখে ফণীবাবু বলিলেন, 'আর রক্ষে নেই, সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

কি সর্বনাশ হইয়াছে শুনিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন,—প্রশ্নবানে ফণীবাবুকে জর্জরিত করিয়া ফেলিলেন সকলেই কিন্তু ফণীবাবুর মুখে শুধু একটি কথা, 'সর্বনাশ হয়েছে।'

'কি হয়েছে বলুন না?' এবার রীতিমত সকলেই চটিয়া উঠিয়াছেন।

ফণীবাবু বলিলেন, 'আমি সে কথা নিজের মুখে বলতে পারব না ভাই, ঐ ঘরে গিয়ে দেখে এস। সকলে নয়, তুই একজন শুধু যাও। খুব চুপি চুপি যাবে।'

এই বলিয়া ফণীবাবু আঙ্গুল দিয়া যে ঘরটি দেখাইয়া দিলেন, সে ঘরটিতে থাকিতেন বয়োবৃদ্ধ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহারই সোদর-প্রতিম শ্রীযুক্ত আশুতোষ কালী মহাশয়।

চুপি চুপি যোগেশবাবু (শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্রবর্তী) সেই ঘরের দিকে গেলেন।

যোগেশবাবু ছিলেন এই সব ব্যাপারে একেবারে সিদ্ধহস্ত, তাঁহাকে কিছু বলিতে হইত না, বলার আগেই কাজটি সুসম্পন্ন

করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিতেন। এবার তাহাই হইল। নিমেষের মধ্যে যোগেশবাবু ফিরিয়া আসিলেন এবং একেবারে প্রায় একহাত জিভ বাহির করিয়া সকলের সামনে দাঁড়াইলেন। বোঝা গেল ব্যাপারটা গুরুতর কিছু নয়, তবুও কি ব্যাপার জানিবার সকলের কৌতূহল চরমে উঠিয়াছিল, সকলেরই মুখে এক প্রশ্ন 'কি, বলুন না যোগেশবাবু।'

যোগেশবাবু তবুও কিছু বলেন না; কেবল জিভ কাটেন। অনেক সাধ্য সাধনার পরে তিনি বলিলেন, 'সত্যি সর্বনাশ হয়েছে, হেমদা গুনগুন করে গান গাইছেন। আমি স্পষ্ট শুনলাম হেমদা গাইছেন—

'বল বল বল সবে—
শত বীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগৎ সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে'—

কথাটা হয়তো সত্য, কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটুকু এত আলোড়নের সৃষ্টি কেন করিল? কারণ একটা অবশ্যই আছে। একটু বিস্তারিত করিয়া না বলিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে না।

দেউলী জেলের প্রথম দফায় যে সব ডেটিনিউরা আসিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত হরিকুমার চক্রবর্তী ছিলেন তাঁহাদের সকলের মধ্যে বয়োবৃদ্ধ। ইঁহাদের দুইজনের মধ্যে কর-গুণতিতে কে কিছুদিনের বড় হইবেন তাহা জানি না, তবে তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে যে সম্বন্ধ ছিল তাহাতে দুইজনকে সমবয়স্ক বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

এই বৃদ্ধদের কথা না বলিলে শুধু দেউলী জেল কেন, কোন জেল জীবনের কাহিনীই সম্পূর্ণ হয় না। কারণ, ইংরেজ আমলে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব হইতে ইংরেজ রাজত্বের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত ইঁহারা বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন। ইহারই পুরস্কার

স্বরূপ কতবার যে বন্দীশালায় পদার্পণ করিয়াছেন তাহার হিসাব নাই। সত্য কথা বলিতে কি, জেল জীবনের বর্ষ গণনা করিলে এই বৃদ্ধদের অনেকেরই হয়তো 'পেনসন' লওয়ার সময় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ সরকার বড়ই সদাশয়, তাই দেখিয়াছি মুক্তহস্তেই এই প্রবীনতম বিপ্লবীদের Extention of Service তাঁহারা মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহার ধাক্কায়, 'পেনসন' ভোগ আর তাঁহাদের অদৃষ্টে জোটে নাই; ইংরেজ রাজত্বের শেষ অধ্যায়েও জেল ভোগ তাঁহাদের করিয়া যাইতে হইয়াছে।

এই বয়োবৃদ্ধদের জন্য সমগ্র তরুণ ডেটেনিউদের প্রাণেই একটি শ্রদ্ধার আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কারণ, ইহাদের জীবনের সব কথা না জানিলেও এই কথাটি তাহারা জানিত যে, বাংলার বিপ্লববাদের গোড়া পত্তনে ইঁহাদের ত্যাগ, ইঁহাদের অধ্যবসায়, ইঁহাদের নীরব নেতৃত্ব কী প্রেরণা জোগাইয়াছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল যখন সমগ্র জাতিকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিয়া নিশ্চিত মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল তখন ইঁহাদের মতই গুটিকয়েক আপনভোলা, আত্মত্যাগী সন্ন্যাসী শৌর্য, সাহস ও চরিত্রবলে সকলের অলক্ষ্যে শাসকের রক্ত দৃষ্টির অন্তরালে বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বালাইয়া রাখিবার কাজে সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

পরাধীনতার অন্ধকার যখন সর্বব্যাপী তখন ইঁহারা সেই অন্ধ তমসার তীরে একটি আলোর প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখিবার প্রয়াসে প্রাণের শেষ সম্বলটুকু লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন।

ইংরেজদের চক্ষে সেদিন ইঁহারা ছিলেন, দস্যু, রাষ্ট্রদ্রোহী। দেশবাসীর কাছেও সেদিন ইঁহাদের সত্যকারের রূপটি ছিল প্রচ্ছন্ন।

তাই দেখিয়াছি, ইংরেজের পুলিস যখন এই বিপ্লবী বীরদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত,

আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া যখন তাঁহারা ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণের পরে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য দেশবাসীর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তখনও এই দেশের অনেক নরনারী তাঁহাদিগকে এতটুকু আশ্রয় দেয় নাই, একটু সাহায্য দিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করে নাই।

পরাধীনতার এই অভিশাপকে হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিয়াই এই আত্মভোলা সন্ন্যাসীর দল আবার পথ চলিয়াছেন, একটু আলোকের জন্য, একটু আনন্দের জন্য।

দুঃখ ইঁহাদিগকে ব্যাহত করে নাই, নৈরাশ্য ইঁহাদিগকে ব্যর্থ করে নাই, দেশবাসীর কৃতঘ্নতা ইঁহাদিগকে নিরাশ করে নাই। প্রতিকূল ঝড়ের অন্ধ-উজান বুকে ঠেলিয়া এ দেশেরই গুটিকয় বিপ্লবী তখন ছুটিয়াছেন নিজের বুকের পাঁজর পুড়াইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে স্বাধীনতার দীপ শিখাটি জ্বালাইয়া রাখিবার সুকঠোর সঙ্কল্প সাধনে।

কীর্ত্তি তাঁহারা চাহেন নাই, নাম চাহেন নাই, প্রতিপত্তি চাহেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন নিস্পৃহ্ দেশ-সেবার পথে নিঃসঙ্কোচ আত্মবিলুপ্তি।

এই আত্মভোলা বীর ভিক্ষুদের নাম সেদিন কেউ জানিত না—আজই বা কতজন জানে?

বিপ্লবীদের যে অধ্যায়গুলি আলোকে ও ঔজ্জ্বল্যে উদ্‌ভাসিত হইয়া আজ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেই ইতিবৃত্ত হয়তো আমরা অনেকে জানি, কিন্তু এই আলোর প্রভাতের পিছনে যে অন্ধরাত্রির তপস্যা তাহার খোঁজ কি আমরা রাখি—বাংলা ও বাঙ্গালী রাখে? তাহারা কি জানে সেই তাপসদের কাহিনী, যাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া তিল তিল করিয়া সারা জীবনের সঞ্চয়কে উজাড় করিয়া দিয়াছে অনাগত এক প্রভাতের আশায়?

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ইঁহাদেব একটু স্থান হইবে কিনা, কে জানে। কিন্তু, জাতির যে সত্যিকারের ইতিহাস

আজও অলিখিত সেই ইতিহাসের অদৃশ্য পাতায় তাঁহাদের কাহিনী অমর হইয়াই থাকিবে।

বয়োবৃদ্ধের কথা বলিতেছিলাম। জেলখানায় তাঁহাদের জীবন যাত্রার ছন্দটি একটি নির্দিষ্ট ছক বাহিয়া চলিত। সকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত সেই যাত্রাপথের কোন ছেদ ছিল না।

অবশ্য এমন কথা বলিতেছিনা যে, জেলের সমগ্র জীবন-প্রবাহের উচ্ছল ধারার সঙ্গে তাঁহাদের জীবনধারার কোন যোগ ছিল না। কিন্তু, সে সংযোগ রক্ষা করিয়াও যাত্রা পথটি ছিল তাঁহাদের স্বতন্ত্র। এই স্বতন্ত্র পথ-পরিক্রমায় হেমদা বা 'বড়দা'র পথটি ছিল আরো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ভোর বেলা আমাদের ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই তাঁহার প্রাতঃভ্রমণের কাজটি শেষ হইয়া যাইত, তাহারও পূর্বে অবশ্য শেষ হইত তাঁহার প্রাতঃকালীন ব্যায়াম। তাহার পরে স্নান, খাওয়া, লেখাপড়া, বিশ্রাম, বৈকালিক ভ্রমণ ইত্যাদি সব কাজই ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিতভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিত।

সে নিয়মের বাঁধন ছিল এত কঠিন যে, ঘড়ির কাঁটার গরমিল হইলেও তাহার রুটিনের কাঁটার এতটুকু গরমিল হওয়ার জো ছিল না। এমন অনেক দিন হইয়াছে যে, বিকাল বেলা বিছানা হইতে উঠি-উঠি করিতেছি, কিন্তু ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না যে, ঘড়িতে কয়টা বাজিয়াছে। এমন সময় বাহিরের দিকে চক্ষু পড়িতেই দেখিতে পাইলাম বড়দা চলিয়াছেন ঘটি হাতে—বুঝিলাম তখন অপরাহ্ণ তিনটা।

ঝড়-বৃষ্টি-বাদল যাহাই হউক না কেন বড়দার রুটিনের কোন ব্যতিক্রম হইত না। এমন অদ্ভুত নিয়ম-নিষ্ঠা জীবনে খুব কমই দেখিয়াছি।

তাঁহার চরিত্রের আর একটি দিকও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত, সেটা তাঁহার আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি। ইতিহাস অনেককেই পড়িতে

দেখিয়াছি, ইতিহাসবেত্তা অনেকের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটিয়াছে, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস ও ভূগোল একেবারে এমন করিয়া আয়ত্ত করিতে কাহাকেও দেখি নাই।

শুধু নাম নিশানা নয়, প্রতিটি ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ, সন, তারিখ মিলাইয়া প্রশ্ন করা মাত্র তিনি বলিয়া দিতে পারিতেন, এমনি অদ্ভুত ছিল তাঁহার স্মৃতিশক্তি। অথচ বাহিরের জগতে কিই-বা এঁদের পরিচয়।

সেই বড়দার (শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ) গানের কথাটা কি ভাবে আসিয়া পড়িল এবং কেনই যে এত আলোড়নের সৃষ্টি করিল তাহাই বলিতেছি।

তাঁহাকে দেখিলে, তাঁহার কথাবার্তা শুনিলে, সকলেরই মনে হইত, তাঁহার রুটিন বাঁধা ঠাসবুনানীতে গান, সুর কিংবা অন্য কোন শিল্পরসের প্রবেশ পথ ছিল না।

গান তিনি যে না শুনিতেন এমন নয়; কিন্তু, তাহা গান ভাল লাগে বলিয়া নয়, লোকে আসিয়া গান শুনিতে তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া যাইত বলিয়া।

তাঁহার বাল্য বন্ধুদের মুখেও শুনিয়াছি গান গাওয়া তো দূরের কথা, গানের ধার ঘেঁষিয়াও তিনি বড় একটা যাইতে চাহিতেন না। কেহ নাকি কোনদিন তাঁহাকে কোন অসতর্ক মুহূর্তেও গুনগুন করিয়া এক আধবার সুর ভাঁজিতে শুনে নাই।

গানের সঙ্গে এত যাঁহার 'সদ্ভাব' তিনি গান গাহিতেছেন এটা শুধু অভাবিত নয়, অভূতপূর্ব। তাই তাঁহার গানে সারা জেলময় সেদিন এত আলোড়ন পড়িয়াছিল। ইহার পরে সেদিন সকলের মুখেই শুধু ঐ একটি কথা—

—'শুনেছিস? হেমদা আজ গান গেয়েছেন!'

—'অসম্ভব!'

এ গান যে স্বকর্ণে শুনে নাই সে সহসা বিশ্বাস করিতে পারিল

না। কিন্তু বিশ্বাস যাহারা করিতে পারিল না তাহাদেরও এ সাহস হইল না যে, তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া আসে কথাটা সত্য কিনা। তাই একদল বিশ্বাস করিল এবং একদল করিল না। কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, দেউলীর সমগ্র আকাশে সেদিন একটি কথা জাগিয়া রহিল—'হেমদা গান গাহিয়াছেন।'

জেলজীবনে কুমিল্লার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ষ্টিভেন্স হত্যাকারী যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিতা বালিকা বন্দী শান্তি-সুনীতিও কিন্তু সেদিন কম গান করেননি কল্যাণী। শুধু গান আর গান। গানে গানে সেদিন বোধহয় তাঁরা ভরে দিয়েছিলেন বাংলার বিভিন্ন বন্দী-নিবাসগুলি।

এমনকি দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণের পরমুহূর্তে পর্যন্ত গান। প্রমাণ সেদিনের সংবাদপত্র।

'....শান্তি ও সুনীতি লাল পাড় শাড়ী ও অনুরূপ রঙের জ্যাকেট পরিয়া এবং হাতে ফুল লইয়া কাঠগড়ায় প্রবেশ করে। তাহারা শান্তভাবে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করে। ...এরূপ প্রকাশ যে, নীচের তলায় বন্দী গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিবার সময় তাহারা গান গাহিতেছিল।' [আনন্দবাজার : ২৮-১-৩২]

আর গান গেয়েছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী নায়ক অনিল রায়। তিনি ছিলেন রীতিমত একজন সুগায়ক। যেমন কণ্ঠ, তেমনি গায়কী। সেদিনের বিপ্লবীদের মধ্যে আজো বোধহয় কেউ তাঁর সেই ভাবগম্ভীর কণ্ঠকে ভুলতে পারেননি।

অমর শহীদ দীনেশ গুপ্তের গানই কি কেউ ভুলতে পেরেছেন কোনদিন। নাকি তা ভোলা সম্ভব।

জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সে কি তাঁর গভীর উপলব্ধি। এ উপলব্ধি সংসারে সত্যই দুর্লভ।

অমর শহীদ দীনেশ গুপ্ত। রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানকারী বীর সেনানী দীনেশ গুপ্ত। কবি, শিল্পী, লেখক, দার্শনিক ও সংগঠক দীনেশ গুপ্ত।

সত্যি বলতে কি, মাত্র বিশ বছর বয়সে তিনি যে অপূর্ব সংগঠনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, অগ্নিযুগের ইতিহাসে তার নজীর খুব কমই আছে।

আর পদে পদে মৃত্যুকে ব্যঙ্গ করার এমন নজীরও এর আগে কেউ কোনদিন দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।

দীনেশ সম্বন্ধে আজ আর নতুন করে কিছু বলার নেই কল্যাণী, কারণ ইতিপূর্বে সব কথাই তোমাদের বলা হয়েছে। তাই পুনরাবৃত্তি না করে আমি শুধু মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি যে কতখানি নির্লিপ্ত ও উদাসীন ছিলেন, সে সম্বন্ধে সামান্য দু একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করব তোমার কাছে।

খাইয়ে ছেলে দীনেশ। খেতেও পারতেন প্রচুর। এ ব্যাপারে কোনরকম বাছ-বিচারও তাঁর ছিল না। যে কোনরকম খাওয়া হলেই হল।

তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল বিক্রমপুরে।

দল-নেতা জ্যোতিষ জোয়ারদারের নেতৃত্বে সবাই সেদিন মার্চ করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন বিক্রমপুরের একটা পথ দিয়ে।

তখনকার দিনে এটা ছিল অনেকটা বাধ্যতামূলক। নিজেকে উপযুক্তভাবে গড়ে নেবার জন্য সবাইকেই সেদিন এভাবে মার্চ করে যেতে হতো গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

যাত্রাবিরতি ঘটল সন্ধ্যা নাগাত গ্রামের একটা বাজারে গিয়ে। আজকের মত এখানেই শেষ। বড্ড ধকল গেছে শরীরের উপর দিয়ে। এবার চাই কিছু খাবার।

খাবার পাওয়া গেল সামনেরই একটা মিষ্টির দোকানে। প্রচুর খাবার।

কিন্তু তা আর কতক্ষণ। দেখতে দেখতেই দোকানের সমস্ত খাবার শেষ। আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অবশ্য তার কোন প্রয়োজনও নেই। প্রচুর খেয়েছে সবাই। এখন বিশ্রামের একটু জায়গা পেলেই হল।

দীনেশ কিন্তু তাতেও খুশি নন। ঠিক যেন মুড আসছে না। আর কি খাওয়া যায়। ঐ তো এক কড়াই মিষ্টির রস রয়েছে। ওটাকে সাবড়ে দিলে কেমন হয়।

কি সর্বনাশ! বাধা দিলেন মিষ্টির দোকানদার, ও যে অনেকদিনের বাসি জিনিস। যেমন টক, তেমনি দুর্গন্ধ। ও জিনিস মুখে তুললে এক্ষুনি ডাক্তার ডাকতে হবে।

নাকি! দেখি তো! বলেই দীনেশ দুহাতে কড়াইটা তুলে নিলেন মুখের কাছে। তারপর চোঁ করে এক চুমুকেই সবটা সাবাড়।

পরের ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩০ সনের সেই স্মরণীয় ৮ই ডিসেম্বর তারিখে।

দীনেশ ও বাদল তখন নিউ পার্ক স্ট্রীটের একটা গোপন আস্তানায়। সেখান থেকেই তাঁদের যেতে হবে রাইটার্স বিল্ডিংসের সেই দুঃসাহসিক অভিযানে। বিনয় বোস আসবেন মেটিয়াবুরুজের রাজেন গুহের বাড়ী থেকে।

আগের দিনই দীনেশ এক কণ্ট্রাক্ট করে নিয়েছেন অ্যাকসন স্কোয়াডের অন্যতম সদস্য নিকুঞ্জ সেনের সঙ্গে। যাবার আগে পেটভরে খাওয়াতে হবে। 'আর না' বলা পর্য্যন্ত খাইয়ে যেতে হবে। আর খাবার মেনু ঠিক করে দেবেন তিনি নিজে।

খাওয়া দেখালেন বটে সেদিন দীনেশ। ঠিক তেমনিই বাদল। এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায় দেখ। অথচ সেদিনই মাত্র ঘণ্টা পরে তাঁদের মৃত্যুবরণ করার কথা। কিন্তু দেখে কে বলবে যে তার জন্য ওদের মনে এতটুকুও দুর্ভাবনা আছে।

শেষ ঘটনা ঘটেছিল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে।

দীনেশ তখন কনডেম্‌ড্‌ সেলে মৃত্যুর অপেক্ষায় দিন গুণছেন। আর দুদিন বাদেই তাঁর ফাঁসি।

দীনেশ নিজেও জানেন সে কথা। কিন্তু তখনো তাঁর সেই একই চেহারা। দিক না ফাঁসি, বয়েই গেল। সময় হলে দিব্যি মজা করে চলে যাব, ব্যস—ফুরিয়ে গেল।

ঘটনাটা ঘটেছিল ঠিক তখনই।

সহকর্মী সুনীল সেনগুপ্তও সেদিন বন্দীজীবন যাপন করছিলেন জেলের এক নম্বর ওয়ার্ডে।

হঠাৎ কি দেখে সুনীলবাবু সেদিন চমকে উঠলেন দারুণ ভাবে।

দীনেশের চিঠি। ওয়ার্ডারের সাহায্যে দীনেশ গোপনে ছোট্ট একটি চিঠি পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে।

কিন্তু কি লিখেছেন দীনেশ তার চিঠিতে?

না, নিজের কোন কথা নয়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কারো কথা নয়। ইহকাল বা পরকাল সম্বন্ধে কোন তত্ত্বকথাও নয়।

লিখেছেন ছোট্ট একটি কথা: 'একটু লুচি মাংস খাওয়াতে পারেন?'

ভাবতে পার কল্যাণী। মৃত্যু সম্বন্ধে কতখানি নির্বিকার হলে ফাঁসির দুদিন পূর্বে এমন চিঠি লেখা সম্ভব, চিন্তা করতে পার একবার!

মৃত্যুকে এমন করে ব্যঙ্গ করার মত দুঃসাহস এর আগে কোথাও দেখেছ কি কোনদিন? শুনেছ কোথাও?

বিপ্লবী জীবন অতি কঠিন, কঠোর। তুচ্ছ ভাবাবেগে ভেঙে পড়া তাঁদের সহজাত ধর্ম নয়। তবু দীনেশের সেই চিঠিটা পড়তে পড়তে অজ্ঞাতেই কখন চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে এল সুনীলবাবুর।

দীনেশ লুচি-মাংস খেতে চেয়েছেন। কি করে তা সম্ভব?

সে নিজেই যে একজন আটক বন্দী। ইচ্ছা থাকলেই বা বন্দী-জীবনে সে সাধ্য তার কোথায়?

এগিয়ে এল বিশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত সেই খুনী আসামী মতি। দু চোখে তার সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা।

কি হয়েছে স্বদেশীবাবুর! মনে হয় কিসের যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে তাঁর ভেতরে ভেতরে। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও তার আলোড়নটা যেন সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অব্যক্ত বোমা আলোড়ন।

সব কথাই খুলে বললেন সুনীলবাবু। বন্দী-জীবনের পরম বন্ধু মতিকে অবিশ্বাস করার মত কোন কারণ নেই।

একটা অসহায় বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল মতি। মনে মনে কি যেন চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর ধরা গলায় একসময়ে বলল:

—লুচির ভার আমি নিলাম বাবু।

—তুমি! সুনীলবাবু অবাক, তুমি এখানে লুচি পাবে কোথায়?

—সে-সব আমি বুঝব। মতি নির্বিকার, আপনাদের ছিচরণের আশীর্বাদে জেল ক্যান্টিনের সবাই আমাকে একটু ভক্তি-ছেদ্দা করে। না দিয়ে যাবে কোথায়! জান লিয়ে লিবো না! কিন্তু মাংস! মাংসের কি হবে! ওখানে তো আমার কোন হাত নেই বাবু।

ভাবনার পর ভাবনা। ঢেউয়ের পর ঢেউ। কি করা যায় এখন!

লুচির জন্য ভাবনা নেই। মতি যখন কথা দিয়েছে, তখন যে করে হোক, কথা সে রাখবেই।

কিন্তু মাংসের কি হবে? কোথায় পাওয়া যাবে মাংস?

দুপুর গড়িয়ে বিকেল। এবার কিছুক্ষণের জন্য বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হবে নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে। বিশেষ কোন বিধি-নিষেধ না

থাকলে এসময়ে ওকে অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেও তেমন কোন বাধা নেই।

অবশ্য মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীরা বাদে। তাদের একমাত্র স্থান সেই কনডেম্‌ড্ সেল। মৃত্যুর পূর্বে কোনরকমেই তাদের বাইরে আসার কোন উপায় নেই।

আস্তে আস্তে সুনীলবাবু একসময়ে এসে দাঁড়ালেন বাইরের সেই নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে। মাথায় রাশি রাশি চিন্তার বোঝা। কি করা যায় এখন। কোথায় পাওয়া যাবে এখন মাংস।

হঠাৎ কি দেখে অলস দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল সুনীলবাবুর। পাঁচিলের ধারে কি ওগুলো।

মুরগী! মুরগী! মুরগী! জেলেরই একপাল পোষা মুরগী।

ওখান থেকে একটাকে ধরে মতির সাহায্যে ক্যান্টিন থেকে ব্যবস্থা করা যায় না?

মুহূর্তে মনস্থির করে সারা গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে নিয়ে এবার গুটি গুটি পায়ে এগুতে লাগলেন সুনীলবাবু।

দীনেশ মাংস খেতে চেয়েছেন। যে করে হোক, কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। নইলে এ দুঃখ যে জীবনেও যাবে না কোনদিন।

—ওটা কি হচ্ছে মশাই?

কে! গলা শুনেই থমকে দাঁড়ালেন সুনীলবাবু। সামনেই দাঁড়িয়ে ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডার ব্যানার্জীবাবু। না, আর হল না।

ব্যানার্জীবাবু কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন অন্য কারণে। রাজনীতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। বোধহয় তারই জন্য তাঁকে রাখা হয়েছিল ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ডে,—যেখানে আইন-কানুনের ততটা কড়াকড়ি নেই। সুখ-সুবিধাও অনেক বেশী।

—ওদিকে যাচ্ছিলেন কোথায় অমন করে? প্রশ্ন করলেন ব্যানার্জীবাবু।

—না না, কিছু না। নিজের মধ্যেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করলেন সুনীলবাবু, এমনিই যাচ্ছিলাম ওদিকে।

—উঁহু, কিছু একটা কারণ আছে নিশ্চয়ই। সব কথা খুলে বলুন। ভয় নেই, আমার দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না আপনার।

রুদ্ধস্বরে সব কথাই খুলে বললেন সুনীলবাবু। মৃত্যুপথযাত্রী দীনেশ কিই বা এমন চেয়েছেন আমাদের কাছে। তাঁর এই অন্তিম ইচ্ছাটুকুও কি আমরা পূরণ করতে পারব না! আপনিও তো মানুষ। বলুন, আপনি হলে কি করতেন এ অবস্থায়! চুপ করে থাকবেন না। বলুন।

নিশ্চল পাথরের মত কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ব্যানার্জীবাবু। তারপর একসময়ে ভাবাবেগে বললেন :

—আপনি আপনার ওয়ার্ডে ফিরে যান সুনীলবাবু। সব দায়িত্ব আমর। যে করে হোক, আমি আমাদের ইয়োরোপীয়ান ওয়ার্ড থেকে কিছু মাংস আপনার কাছে পৌঁছে দেব। বাদবাকী দায়িত্ব আপনার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার কথা আমি রাখব।

ব্যানার্জীবাবু সত্যিই সেদিন তাঁর কথা রেখেছিলেন কল্যাণী। প্রতিশ্রুতি মত যথাসময়েই তিনি সেই মাংস পৌঁছে দিয়েছিলেন সুনীলবাবুর কাছে।

কিন্তু সুনীলবাবু! একবারও কি তিনি ঘুমোতে পেরেছিলেন সেই রাত্রে!

না, পারেননি। বার বার চোখের সমস্ত দৃষ্টি জুড়ে ভেসে উঠেছিল সেই একটাই মাত্র ছবি।

দীনেশ! দীনেশ! দীনেশ! দীনেশ খেতে ভালবাসেন। নিজে থেকেই তিনি আগ্রহ করে লুচি-মাংস খেতে চেয়েছিলেন তার কাছে।

খাও বন্ধু, খাও। আমি যে হাত-পা বাঁধা এক অসহায়, আটক

বন্দী। ইচ্ছা থাকলেই বা আজ তোমাকে এর চাইতে বেশী কিছু দেবার মত সাধ্য আমার কোথায়?

আর মতি! বিশ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত, সবার উপেক্ষিত খুনী আসামী মতির চোখেই কি ঘুম ছিল সে রাত্রে! তোমার কি মনে হয় কল্যাণী!

১৯৩১ সন। ৬ই জুলাই।

সকাল থেকেই সাজ-সাজ রব সেদিন আলিপুর জেলে। ভোর-রাত্রে দীনেশকে ফাঁসি দেওয়া হবে তারই প্রস্তুতি চলছে সারাদিন ধরে।

দীনেশ তেমনিই নির্বিকার। করুক না ওরা যা খুশি। মৃত্যু তো তার কাছে একটা খেলামাত্র।

পশ্চিম আকাশে বিদায়ী সূর্যের অস্তরাগ। ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে তারই একফালি রশ্মি এসে ছড়িয়ে পড়েছে কনডেম্‌ড্‌ সেলের অভ্যন্তরে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা দীনেশের সারা মন ভরে উঠল এক অপার্থিব আনন্দের হিল্লোলে। তারপর নিজের অজ্ঞাতেই কখন তিনি একসময়ে তন্ময় হয়ে গুনগুনিয়ে উঠলেন:

'রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার
যাবার আগে,
আপন রাগে,
গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে
যাবার আগে যাও গো আমায়
জাগিয়ে দিয়ে,
রক্তে তোমার চরণ দোলা—
লাগিয়ে দিয়ে—'

দেখতে দেখতে একসময়ে শেষ রশ্মিটুকু মিলিয়ে গেল। নেমে এল অন্ধকারের কালো যবনিকা।

তারপর। পরের কাহিনী সংবাদপত্র থেকেই তুলে দিচ্ছি।

'বিশ বছরের বালক দীনেশ ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দিল। কৌতূহলী বালক যেমন নূতন খেলনা ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে লালায়িত হয়, অসীম রহস্যময় মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইতে তাহার তেমনি সাধ হইয়াছিল।

মাতা পিতা, স্নেহশীলা ভ্রাতৃজায়া সকলকে সে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে, মৃত্যু ভয়ঙ্কর নহে, সে মরণমালা। মরণমালা গলায় পরিয়া মরণজয়ী জীবনের জয়োল্লাসে চলিয়া গেল।

....দীনেশ বাঁচিল না। তাঁহাকে মৃত্যুর-গ্রাস হইতে রক্ষা করা গেল না। খেদক্লিন্ন নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস একটা জাতির পঞ্জর-পিঞ্জর কাঁপাইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল। কম্পিত অধরোষ্ঠে কি কথা মৌন রহিয়া গেল, বোঝা গেল না।

কেহ কি বুঝিবে?' [আনন্দবাজার, ৮ই জুলাই, ১৯৩১]

এবার শোন আন্দামান সেলুলার জেলের জলসার কথা। জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সেকি অপূর্ব জলসা। চিন্তাও বুঝি করা যায় না।

সে জলসার প্রধান শিল্পী ছিলেন মোহিত মৈত্র। মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদ মোহিত মৈত্র। অত্যন্ত সুগায়ক ছিলেন তিনি। গানও তিনি প্রচুর গেয়েছেন বন্দীজীবনে। চোখের সামনে মৃত্যুর কালো যবনিকা। আশ্চর্য্য, তখনো মুখে সেই অবিস্মরণীয় গান।

ভাবতে পার কল্যাণী! চোখ বুজে দেখোইনা একবার চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে প্রাক্তন আন্দামান বন্দীদের মুখপত্র 'মুক্তিতীর্থ আন্দামান' পুস্তিকায় কি লেখা রয়েছে শোন:

"ফরসা, তীক্ষ্ণ চেহারার মোহিতের সুন্দর দর্শন, তাঁর প্রাণোচ্ছল

কথা-বার্তা ও হাব-ভাব, সুকণ্ঠ সঙ্গীত, আশেপাশের সকলকে বিমোহিত করত।....

কারাদণ্ডের প্রায় এক বছরকাল আলিপুর জেলে স্বাধীনতা সংগ্রামী অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তাঁর দিন কাটে। এ সময়েই গানে গল্পে হাসিতে উচ্ছাসে মোহিতের প্রাণোচ্ছলতার সঙ্গে সকল বন্দীর পরিচয় ঘটে। মোহিত ছিল সকলের বন্ধু—অজাতশত্রু।

জেল জীবনের কর্কশ ক্লেশকে মোহিত গানে-গানে সরস করে তুলতেন। সুকণ্ঠ মোহিত একা গাইতেন, দল বেঁধে গাইতেন,—গানের আসরে সবাইকে টেনে আনতেন। গান ছিল মোহিতের প্রাণ, —মোহিতের প্রাণ ছিল গানময়।

১৯৩৩-এ অনশন সংগ্রাম শুরু হবার মাত্র কয়েক দিন আগে মোহিত আলিপুর জেল থেকে সেলুলার জেলে আসেন।

এসেই তিনি অনশন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সেই ১৭ই মে তারিখে বলপূর্বক খাওয়াবার নাম করে যে বর্বর প্রাণহত্যার অভিনয় চলে, মোহিতও তারই শিকার হন। ফুসফুসে দুধ ঢুকিয়ে দেওয়ায় প্রথমে যন্ত্রণা—তারপর জ্বর।

নিমোনিয়া ব্যাধির সঙ্গে মোহিতের চলে দীর্ঘ দশদিনব্যাপী লড়াই। জেল হাসপাতালে মোহনকিশোরের পাশাপাশি একটি আলাদা কেবিনে তাঁর যন্ত্রণাকাতর দেহ মৃত্যুর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন লড়াই চালিয়ে গেছে। বন্ধুপ্রিয় মোহিত সেই চরম দিনগুলিতেও প্রিয় মুখগুলোর কথা ভোলেনি।

সিরাজুল হক, কালিপদ রায়—এদের নাম ধরে ধরে ডেকেছে মৃত্যুর আগে। গানের সুর ভেজেছে—সেই যমুনা নদীর উদাসী আবহাওয়ায় লালিত কণ্ঠে তাঁর সেই প্রিয় গানের কলি—'চৈতী রাতের উদাস হাওয়ায়....'

তারপর, ২৮শে মে এমনি গানের কলির ক্ষীণ আওয়াজ ক্ষীণতর হয়ে তাঁর জীবন-প্রদীপের যবনিকাকে টেনে দিল।

শহীত মোহিতের জন্য সেদিন অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা হয়নি। লোক-চক্ষুর আড়ালে তাঁর জীবনহীন পবিত্র দেহটি ভারি পাথরে ভারাক্রান্ত করে কসাইয়ের দল এবারডীন উপকূলে গভীর সমুদ্রে হিংস্র হাঙ্গরের মুখে নিক্ষেপ করে দিয়েছিল।

কিন্তু, সুদর্শন সুগায়ক প্রাণোচ্ছল মোহিত শহীদ হয়ে চিরজীবি হয়ে আছে। জলপাইগুড়ি শহরের উপকণ্ঠে মোহিতনগর কলোনী আজও তাঁর পবিত্র স্মৃতি বহন করে চলেছে।'

১১ই মার্চ, মঙ্গলবার। আজ তোমার চলে যাবার দিন কল্যাণী।

আর কিছুক্ষণ মাত্র। তারপরই তোমাকে বিদায় দিতে হবে দীর্ঘদিনের জন্য। তাই আর দু' একটি উল্লেখযোগ্য জলসার কথা বলেই আমি এবারের মত ইতি টানছি।

এ জলসাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলার হলদিঘাট মেদিনীপুর জেলের অভ্যন্তরে। তারিখটা ছিল ১৯৩৪ সনের ৫ই জুন।

পাশাপাশি দুটি কনডেম্‌ড্‌ সেল। একটিতে রয়েছেন চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের অন্যতম নায়ক অম্বিকা চক্রবর্তী। অন্যটিতে কৃষ্ণ চৌধুরী আর হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য। সবাই তখন প্রহর গুণে চলেছেন মৃত্যুর অপেক্ষায়।

অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত অম্বিকা চক্রবর্তীকে ফাঁসির রজ্জুতে প্রাণ দিতে হয়নি। পরবর্তীকালে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়েছিল হাইকোর্টের নির্দেশে। তবে তখনো পর্য্যন্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশই বহাল ছিল।

কিন্তু কেন? অম্বিকা চক্রবর্তী যুব বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক। এ হেন দুর্ধর্ষ বিপ্লবীকে যে শাসক সম্প্রদায় সহজে রেহাই দেবে না, তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু কৃষ্ণ চৌধুরী বা হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রতি সদাশয় সরকার বাহাদুরের এতটা রূঢ় হবার কারণ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে আমাদের আরো একটু পিছিয়ে যেতে হবে কল্যাণী।

নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মাষ্টারদা তখন লৌহকপাটের আড়ালে বন্দী। বিচারে তাঁকে সাজা দেওয়া হয়েছে প্রাণদণ্ড। তার প্রতিশোধ নিতে হবে।

কিন্তু কে নেবে প্রতিশোধ!

সবাই তখন কারা প্রাচীরের অন্তরালে। এ অবস্থায় কে নেবে এই দায়িত্বভার?

এগিয়ে এলেন নিত্যগোপাল সেন, হিমাংশু চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ চট্টলের বালকবৃন্দ। আমরা দায়িত্ব নেবে।

মাষ্টারদার প্রতি এই অন্যায় আদেশ কিছুতেই আমরা সহ্য করব না। আমরা এর জবাব দেব।

জবাব দিলেন ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ সন, পল্টনের ক্রিকেট খেলার মাঠে।

শাসকদের সবাই সেদিন জড়ো হয়েছেন পল্টনের ক্রিকেট মাঠে। চারপাশে পুলিস ও মিলিটারীর লৌহ-বেষ্টনী। সুতরাং ভয়ের কোন প্রশ্নই নেই।

সব কিছু দেখেও সহসা দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়লেন চট্টলের সেই মৃত্যুভয়হীন বালকবৃন্দ। তারপরই বিস্ফোরণ—বুম্‌ম্‌ম্‌! বুম্‌ম্‌ম্‌। সঙ্গে রিভলবার গর্জন—ড্রাম! ড্রাম! ড্রাম!

রক্তে রক্তে স্নান করে উঠলেন পুলিস-সুপার মিঃ ক্লিয়ারী। সেই সঙ্গে আরো কয়েকজন।

তারপরই শুরু হল পাল্টা আক্রমণ।

ফলে যা হবার তাই হল। নিত্যগোপাল সেন ও হিমাংশু চক্রবর্ত্তী ঘটনাস্থলেই নিহত হলেন। আর কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে দেওয়া হল প্রাণদণ্ড।

প্রহরে প্রহরে রাত্রি এগিয়ে চলেছে। থমথমে কালরাত্রি।

মনে সেদিন ঝড় বইছে অম্বিকা চক্রবর্তীর। উদ্দাম ঝড়।

দুঃখ নিজের জন্য নয়। আসুক না মৃত্যু। এমন কতবারই তো মৃত্যু এসে হানা দিয়েছিল তার শিয়রে।

একবার সুলুকবাহার পাহাড়ে। আর একবার জালালাবাদের যুদ্ধে। এমন মারাত্মক মেশিনগানের গুলী খেয়েও যে তিনি শেষ পর্য্যন্ত বেঁচে যাবেন, তা কে ভাবতে পেরেছিল। নিজেই কি ভাবতে পেরেছিলেন কোনদিন?

দুঃখ—কৃষ্ণ ও হরেন্দ্রর জন্য।

আজই ওদের জীবনের শেষ রাত্রি। ভোর-রাত্রে ওদের ফাঁসি দেওয়া হবে একথা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কতই বা বয়েস ওদের। বলতে গেলে ছেলের বয়েসী। অথচ এরই মধ্যেই কিনা বিদায়ের শেষ প্রহর ঘনিয়ে এল ওদের জীবনে।

অদ্ভুত ছেলে ঐ কৃষ্ণপদ চৌধুরী।

জালালাবাদ যুদ্ধের শেষে সবাইকে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়তে হল মাষ্টারদার নির্দেশে।

কৃষ্ণপদকেও তাই মেনে নিতে হল। সে চলে গেল শহর থেকে অনেক দূরে এক পাহাড়ীদের গাঁয়ে। সেখানেই সে একনাগাড়ে কাটিয়ে দিল পুরো তিনটি বছর।

কিন্তু এ যে নিশির ডাক। এ ডাক যে একবার শুনেছে, তার যে কিছুতেই আর রেহাই নেই।

তাই আবার সে একদিন শহরে ফিরে এল অস্থির হয়ে। কাজ চাই। সুযোগ চাই। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই এক এক করে চলে গেছে শহীদ-তীর্থে। তারও সেখানে যাবার জন্য ছাড়পত্র চাই।

আশ্চর্য, কেউ সেদিন চিনতে পারেনি কৃষ্ণপদকে। কি চেহারায় কি কথাবার্তা, কি চালচলনে, ঠিক যেন কোন পাহাড়ী ছেলে। তিন বছরে এতটা পরিবর্তন চিন্তাই যেন করা যায় না।

সেই কৃষ্ণপদ আর হরেন্দ্র ভট্টাচার্যকেই ভোর-রাত্রে প্রাণ দিতে হবে ফাঁসির মঞ্চে। এখন শুধু অপেক্ষা মাত্র।

প্রহরের পর প্রহর এগিয়ে যায়।

ভাবনার পর ভাবনা এসে জমতে থাকে অম্বিকা চক্রবর্তীর মনের কোঠায়। অস্থির চঞ্চল সব ভাবনা।

আর কতক্ষণই বা। সময় তো হয়ে এল বলে।

ওরা হয়তো খুব ভয় পেয়েছে। হয়তো খুবই ভেঙে পড়েছে। নইলে ওদের কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন!

না, চুপ করে না থেকে এ সময়ে ওদের একটু সান্ত্বনা দেওয়া উচিত।

কোথায় সান্ত্বনা, কোথায় কি! আসল ব্যাপার কিন্তু ঠিক তার বিপরীত কল্যাণী।

সেই একই চিন্তা তখন অনুরণন তুলেছে হরেন্দ্র ও কৃষ্ণপদর মনে। অম্বিকাদার খবর কি?

এত চুপচাপ কেন তিনি আজ?

বোধহয় তাদের কথা চিন্তা করে তিনি আজ খুব দুঃখ পাচ্ছেন মনে মনে। না, এ সময়ে তাঁকে একটু সান্ত্বনা দেওয়া উচিত।

—অম্বিকাদা! ডাক ভেসে এল পাশের কনডেম্ড্ সেল থেকে।

—কি ভাই? সাড়া দিলেন অম্বিকা চক্রবর্তী।

—কথা বলছেন না কেন আপনি! কি এত ভাবছেন মনে মনে?

—কিছু না ভাই। নিজের মধ্যেই একটা দীর্ঘনিশ্বাস গোপন করলেন অম্বিকা চক্রবর্তী, এমনিই চুপচাপ বসে আছি।

—মোটেই না। আমরা জানি আপনি কি ভাবছেন। এটা কিন্তু মোটেই ঠিক নয় অম্বিকাদা। দেশের জন্য প্রাণ দেব,—এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। এমন সৌভাগ্য ক'জনের হয় বলুন?

দেখুন না আমরা কেমন মনের আনন্দে গান গাইছি এখন।

কোনরকমে কথাটা বলেই এবার দুজনে গান ধরলেন দ্বৈতকণ্ঠে :

'...টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল,
বাঁচি আর মরি
বহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।'

—শুনতে পাচ্ছেন অম্বিকাদা? তাহলেই বুঝে দেখুন যে আজ আমাদের মনে কত আনন্দ। যাক, আমরা আবার গাইছি। আপনিও গান না আমাদের সঙ্গে।

'....কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্র তীর-পানে
দিতে হবে পাড়ি।
তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারি দিক হতে ওই
দাঁড় হাতে ছুটে আসে দাঁড়ী

গান শেষ না হতেই শুরু হল আবৃত্তি :

'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়-গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।'

এমনি করে সারা রাত। একটার পর একটা। অসংখ্য।

কণ্ঠে যত গান ছিল, যত সুর ছিল, এক এক করে সবই বুঝি

তাঁরা উজাড় করে ঢেলে দিলেন তাঁদের একান্ত প্রিয় অম্বিকাদার কাছে।

দেখতে দেখতে এক সময়ে রাত ভোর হয়ে এল। পূব আকাশে দেখা দিল প্রত্যুষের রক্তরাঙা ইশারা।

আবার সেই প্রাণোচ্ছল কণ্ঠ ভেসে এল পাশের কনডেম্‌ড্‌ সেল থেকে।

—আমরা যাচ্ছি অম্বিকাদা। আপনি দুঃখ করবেন না যেন। তাহলে কিন্তু আমরাও দুঃখ পাব। যাই এবার। বন্দেমাতরম্‌।

'বন্দেমাতরম্‌!'

আর একটি কথাও বলতে পারলেন না অম্বিকা চক্রবর্তী। কি বলবেন! বলার আছেই বা কি! নিজে তিনি চেয়েছিলেন ওদের একটু সান্ত্বনা দিতে, আর ওরাই কিনা উল্টে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গেল সারা রাত ধরে।

এবার তোমাকে আর একটি জলসার কথা বলেই আমি বিদায় নেবো কল্যাণী। এ জলসাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সবার অগোচরে মাদ্রাজ ফোর্টে।

১৯৪৩ সনের কথা। যুদ্ধের আগুনে সারা পৃথিবী তখন জ্বলছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতিটি ভারতীয় তখন দেশপ্রেমের বন্যায় উদ্দীপ্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

আহত ব্রিটিশ সিংহের অন্তিম সময় উপস্থিত। সিঙ্গাপুরের পতন হয়েছে। পতন হয়েছে গোটা বর্মার। এই তো সুযোগ। এবার একটা চরম আঘাত হেনে ঐ রক্ত চোষা জাতকে ভারতের মাটি থেকে চিরতরে দূর করে দিতে হবে।

ভিক্ষায় কোনদিনও স্বাধীনতা আসেনা। আবেদন নিবেদন বা দর কষাকষিতেও নয়। চাই সংগ্রাম। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমরা বিদেশীর কবল থেকে ছিনিয়ে নেবো আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় মাতৃভূমিকে। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই।

জানি তার জন্য আমাদের মূল্য দিতে হবে। দিতে হবে অসংখ্য তাজা প্রাণ। তাই দেবো। তবু এবারের এই অপূর্ব সুযোগটিকে আমরা কোনরকমেই হারাতে রাজী নই।

তার আগে কয়েকজন দুঃসাহসী তরুণকে উপযুক্ত বেতার ট্রান্সমিটার সহ গোপনে ফিরে যেতে হবে ভারতে। ট্রান্সমিটারের সাহায্যে জানাতে হবে শত্রুর সামরিক শক্তি সম্বন্ধে খুটিনাটি খবর। জানাতে হবে ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা। জানাতে হবে সব কিছু।

তোমাদের মধ্যে কে কে রাজী আছ এই কঠিন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে ভারতে ফিরে যেতে ?

সবাই রাজী। স্বাধীনতার এই শেষ সংগ্রামে কেউ পিছিয়ে থাকতে রাজী নয়।

শেষ পর্য্যন্ত মোট চৌদ্দজনকে সেবার বিভিন্ন দলে ভাগ করে পাঠানো হল ভারতবর্ষে।

সবার আগে এম. এ. কাদের, এস. এ. আনন্দম প্রমুখ পাঁচজনের একটি দল এসে অবতরণ করল কালিকটের উপকূলে।

অন্যদলে বেতার বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বাঙ্গালী তরুণ সত্যেন বর্ধন ও আরো চারজন। তাঁদের লক্ষ্য কাঠিয়াবারের উপকূল।

হঠাৎ সেদিন একটা সাবমেরিনের পেরিস্কোপ আস্তে আস্তে ভেসে উঠল জলের উপর। তারপর গোটা সাবমেরিনটাই।

না, কাছে কিনারে বাধা দেবার মত শত্রুপক্ষের কোন কিছু নেই। সামান্য কোন জাহাজ বা জেলেডিঙি পর্য্যন্ত নজরে পড়ে না। সুতরাং, চটপট রবারের ডিঙিতে উঠে এবার তোমরা নির্ভয়ে এগিয়ে যাও উপকূলের দিকে। এখান থেকে উপকূলের দূরত্ব মাত্র পাঁচ মাইল। আশা করি এটুকু পথ অতিক্রম করতে তোমাদের খুব একটা বেশী সময় লাগবেনা। কামনা করি, তোমাদের যাত্রাপথ শুভ হোক।

যাত্রাপথ কিন্তু মোটেই শুভ হয়নি কল্যাণী। সেই কাহিনী তোমাকে এখন বলবো।

ট্রান্সমিটার সহ রবারের ডিঙিতে চেপে পাঁচজন ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছেন উপকূলের দিকে। চোখে দিগন্ত সীমার মত উন্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টি। বুকে দুর্বার সাহস। এগিয়ে চলাই আমাদের সহজাত ধর্ম। এগিয়ে আমরা যাবোই। কেউ পারবেনা আমাদের গতিরোধ করতে। কেউ না।

ততক্ষণে সাবমেরিনটা আবার তলিয়ে গেছে জলের নীচে।

সমুদ্রের বুকে খানিকটা ভাসমান তেল ছাড়া আর কোন কিছুর চিহ্ন মাত্রও নজরে পড়েনা।

দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা। তারপর রাত্রি।

অশান্ত সমুদ্র। অবিরাম ঢেউ গড়ছে আর ভাঙছে। অবিরাম সেই ঢেউ ভাঙার শব্দ চলছে। যেন শেষ নেই এই ভাঙাগড়া মিছিলের।

উত্তাল ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আস্তে আস্তে রবারের ডিঙিটা এগিয়ে চলেছে তীরের দিকে। আর বেশী বাকী নেই। মাইল খানেক মাত্র।

দেখতে দেখতে একসময়ে মেঘে মেঘে কালো হয়ে উঠল আকাশটা। শুরু হল ঠাণ্ডা হাওয়া।

শঙ্কায় শুকনো হয়ে উঠল সত্যেন বর্ধনের মুখ। গতিক সুবিধার নয়। সমুদ্র আজ সারাদিন ধরেই অশান্ত। বাতাসও ক্ষেপে উঠেছে। মনে হয়, বড় রকমের ঝড় উঠবে। মেঘের কুণ্ডলীতে যেন তারই আভাস।

অনুমানে মিথ্যে হলনা। সহসা ঈশান কোণ থেকে বাতাস ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মত। সঙ্গে সঙ্গে উদ্দাম উচ্ছল সমুদ্রের সেকি বিচিত্র রূপ। সেকি তার নাচের ঘটা।

বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, উৎক্ষিপ্ত দু বাহু আকাশে তুলে দুরন্ত

আক্রোশে মুহুর্মুহু সে আঘাত করতে লাগল রবারের পাতলা নৌকোটার উপর। যেন নিজ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশকারী এই তুচ্ছ প্রাণী ক'টাকে অতল সমাধিতে না পাঠানো পর্য্যন্ত কিছুতেই তার শান্তি নেই।

ঝড়ের সঙ্গে প্রাণপণে লড়াই করে এগিয়ে চলেছেন ওরা পাঁচজন। কিন্তু কোথায় উপকূল। কোথায় কি। উপকূলের চিহ্নও নজরে পড়েনা কোথাও। উদ্দাম বাতাসের ঝাপটায় রবারের ডিঙিটা যে আপন খেয়ালে কোথায় কোন অনির্দেশের পথে তখন ছুটে চলেছে কে জানে।

এমনি করে সারারাত। কথা ছিল রাত্রির প্রথম ভাগেই তাঁরা তীরে অবতরণ করবেন, কিন্তু সব কিছুই ওলট পালট হয়ে গেল এই ঝড়ের জন্য। ফলে মাত্র পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করতে তাঁদের সময় লেগে গেল দীর্ঘ একুশ ঘণ্টা।

ওদিকে ততক্ষণে অন্ধকার কেটে গিয়ে পূর্ব আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয়েছে একটি দুটি করে। এ অবস্থায় কিছু একটা বিপদ ঘটে যাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

হলও তাই। সহসা কি দেখে থমকে দাঁড়াল স্থানীয় একজন গ্রাম্য লোক। চোখেমুখে তার অধীর কৌতূহল।

বাঃ। কি সুন্দর এই ডিঙিটা। কিন্তু একি! এতো কাঠের তৈরী ডিঙি নয়। এ যে রবারের। এ ডিঙি কোথা থেকে এল! আমাদের দেশে তো এ জিনিসের কোন প্রচলন নেই! ওরা কারা! এলই বা কোথা থেকে!

একজনের মুখ থেকে অন্যজন। তারপর গোটা গাঁ জুড়ে সেই একই কথা। ওরা কারা! রবারের ডিঙি করে এলই বা কোথা থেকে!

শেষ পর্য্যন্ত স্থানীয় থানাতে। রবারের ডিঙি চেপে কারা এসেছে গো বাবু! ওরা কারা!

যুদ্ধের সময়, তাই খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গেই পুলিস বাহিনী ছুটে এল ঘটনাস্থলে। কই, কোথায় ওরা। রবারের ভিডিটাই বা কোথায়।

সত্যেনের তখন একমাত্র চেষ্টা সবাইকে নিয়ে জনতার ভীড়ে মিশে যাওয়া, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পরাধীন থেকে গোলামী করাটাকে যারা বেঁচে থাকার প্রশস্ত পথ বলে মেনে নিয়েছে, তাদের কাছে সহযোগিতার আশা করাও যে বাতুলতা মাত্র। তাই যাদের মুক্তির জন্য এই মরণপণ সংগ্রাম, সেই গ্রামবাসীরাই তাদের উদ্যোগী হয়ে ধরিয়ে দিল পুলিসের হাতে।

প্রথম দলে আগত এম. এ. কাদের, এস এ. আনন্দম প্রমুখরাও রেহাই পেলেন না। তারাও একদিন পুলিসের হাতে ধরা পড়ে গেলেন আকস্মিক ভাবে।

আর ধরা পড়লেন ফৌজ সিং এবং সেই সঙ্গে আরো কয়েকজন। তাঁরা এসেছিলেন স্থল পথ ধরে আসামের মধ্য দিয়ে।

সবাইকে নিয়ে যাওয়া হল মাদ্রাজ কোর্টে।

৮ই মার্চ বিচার শুরু হল সবার অগোচরে, অতি সন্তর্পণে। সাবধান, ভারতবাসী যেন ঘুনাক্ষরেও এ খবর জানতে না পারে। আগষ্ট আন্দোলনের আগুন তখনো নেভেনি। এ অবস্থায় সুভাষ বোসের কর্মতৎপরতার খবর একবার তাদের কানে গেলে আর রক্ষে নেই।

রায় দেওয়া হল পয়লা এপ্রিল। আসামী সংখ্যা মোট পাঁচজন। অভিযোগ সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রচেষ্টা। বিচারে সত্যেন বর্ধন, আব্দুল কাদের, আনন্দম ও ফৌজ সিং—এই চারজনকেই দেওয়া হল মৃত্যুদণ্ড। আপীলে বাকী একজনকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে দেওয়া হল—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বন্দীরা নির্বিকার। গানে, গল্পে, আনন্দে, উচ্ছাসে সর্বক্ষণই তারা ভরপুর। যেন মৃত্যু তাঁদের কাছে একটা খেলামাত্র।

এই কনডেম্‌ড্‌ সেল থেকেই সত্যেন একদিন চিঠি লিখে পাঠালেন তাঁর দাদাকে :

…'মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেওয়া বাঙ্গালীর পক্ষে নতুন কিছু নয়। আমি গর্বিত যে, ভগবান আমাকে প্রাণ দেবার সেই সুযোগ দিয়েছেন।'

ফাঁসির দিন ধার্য্য হল ১০ই সেপ্টেম্বর। সত্যেনকেও সেকথা জানিয়ে দেওয়া হল যথাসময়ে।

সত্যেন তেমনিই নির্বিকার। দিকনা ওরা ফাঁসি। সময় হলে দিব্বি চলে যাবো, ব্যস ফুরিয়ে গেল।

সন্ধ্যার পরেই শুরু হল সেই জলসা। শুধু গান-গান আর গান। কখনো বা আবৃত্তি। মাঝে মাঝে নেতাজীর বিচ্ছিন্ন টুকরো টুকরো বাণী। নেতাজীর সব কথা আজ শুনিয়ে যেতে হবে দেশবাসীকে। বলে যেতে হবে যে, দিন আগত ঐ। সংগ্রাম আসন্ন। স্বাধীনতার শেষ সংগ্রাম। তোমরা প্রস্তুত হও।

প্রথমেই সত্যেনের মুখ থেকে শোনা গেল সেই ঐতিহাসিক মার্চ সঙ্গীত :

> 'কদম কদম বঢ়ায়ে যা
> খুশি সে গীত গায়ে যা
> ইয়ে জিন্দেগী হ্যায় কৌম কী,
> (তো) কৌম্‌ পৈ লুটায়ে যা '

এবার ভিন্ন ভিন্ন সেল থেকে সুর মেলালেন আব্দুল কাদের, আনন্দম, ফৌজ সিং ও অন্যান্য সবাই।

> 'তু শের-ই-হিন্দ আগে বঢ়
> মরনেসে ফিরভী তু ন ডর
> আসমান তক্‌ উঠাকে শির,
> যো সে বতন বঢ়ায়ে যা।'

মার্চ সঙ্গীত শেষ হতে না হতেই আবার আজাদ হিন্দ বাহিনীর জঙ্গী গীত মূর্ত্ত হয়ে উঠল সত্যেনের কণ্ঠে।

'অব্ দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী চলেঙ্গে

রোকেন হম্ কিসীকো রু কেঁ হ্যায় ন রুকেঙ্গে।'

গানের পরে আবৃত্তি:

'মোরা একই বৃন্তে দুটি ফুল হিন্দু মুসলমান,

মুসলীম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।'

—সাবাস ভাই, সাবাস! পাশের কনডেম্‌ড্ সেল থেকে তারিফ জানালেন আব্দুল কাদের, এই তো সাচ্চা কথা। এই তো আমাদের শিখিয়েছেন নেতাজী।

আবৃত্তির পরে নেতাজীর কিছু কিছু মূল্যবান উদ্ধৃতি:

"দেশবাসী পক্ষ থেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিলে তিলে জীবন দিয়ে আমি প্রায়শ্চিত্ত করে যাবো। তার পর মাথার উপর যদি ভগবান থাকেন, পৃথিবীতে যদি সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়, তবে আমার অন্তরের কথা দেশবাসী একদিন না একদিন বুঝবেই।"

এবার সাড়া দিলেন এস. এ. আনন্দম:

'Freedom is not given, it is taken. Freedom never could be a gift, because every gift carries its obligations, its ties…'

দেখতে দেখতে একসময়ে পূব আকাশটা ফর্সা হয়ে এল। ভেসে এল দূরাগত মিলিটারী বুটের ভারী শব্দ—গট্‌গট্—গট্‌গট্—গট্‌গট্…

ক্রমশঃ শব্দটা এগিয়ে এল আরো কাছে। তারপরই শোনা গেল সেলের তালা খোলার শব্দ। প্রস্তুত হও। এবার যেতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল সত্যেনের প্রাণোচ্ছল কণ্ঠ,—হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত। আব্দুল কাদের, আনন্দম ও ফৌজ সিং-এরও সেই একই কথা। আমরাও প্রস্তুত। আমরা আজাদী সৈনিক। মৃত্যুকে আমরা কোনদিনও ভয় পাইনে। চলো কোথায় যেতে হবে। বলো ভাইসব—'নেতাজী জিন্দাবাদ!'

নেতাজী জিন্দাবাদ! নেতাজী জিন্দাবাদ। নেতাজী জিন্দাবাদ!

গট্‌গট্‌—গট্‌গট্‌—গট্‌গট্‌…

আবার আস্তে আস্তে এক সময় বুটের শব্দ মিলিয়ে গেল একটু একটু করে। তখনও দূর থেকে ভেসে আসা স্বরে শোনা যেতে লাগল সেই একই ধ্বনি,··নেতাজী জিন্দাবাদ! নেতাজী জিন্দাবাদ। নেতাজী জিন্দাবাদ!

তারপরই সব স্থির। সব শান্ত। কোথাও আর কোন সাড়া শব্দ নেই।

সব যেমন ছিল, তেমনিই রয়েছে। কোথাও কোন পরিবর্তন নেই। সব ঠিক থাকবে। সবই চলবে সংসারের অপরিবর্তনীয় নিয়মের নির্দেশে।

শুধু পাখীর কলরব শান্ত হয়ে গেছে। সে কলকণ্ঠ এখন একেবারেই স্তব্ধ।

কিন্তু সবার অলক্ষ্যে মহাকাল যে ইতিহাস লিখে চলেছেন, সেখানেও কি ওদের কলকণ্ঠ আর কোনদিনই মুখর হয়ে উঠবেনা?

জবাব দেবার দায়িত্ব তোমাদের।

তোমরা তার জবাব দেবেনা? ঋণ স্বীকার করবে না? মাথা নোয়াবেনা ওদের নাম স্মরণ করে?

নাকি অকৃতজ্ঞ বলে জাতির ইতিহাসে এমনি করেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে চিরকাল?